ও আমার চাঁদের আলো

ইমদাদুল হক মিলন

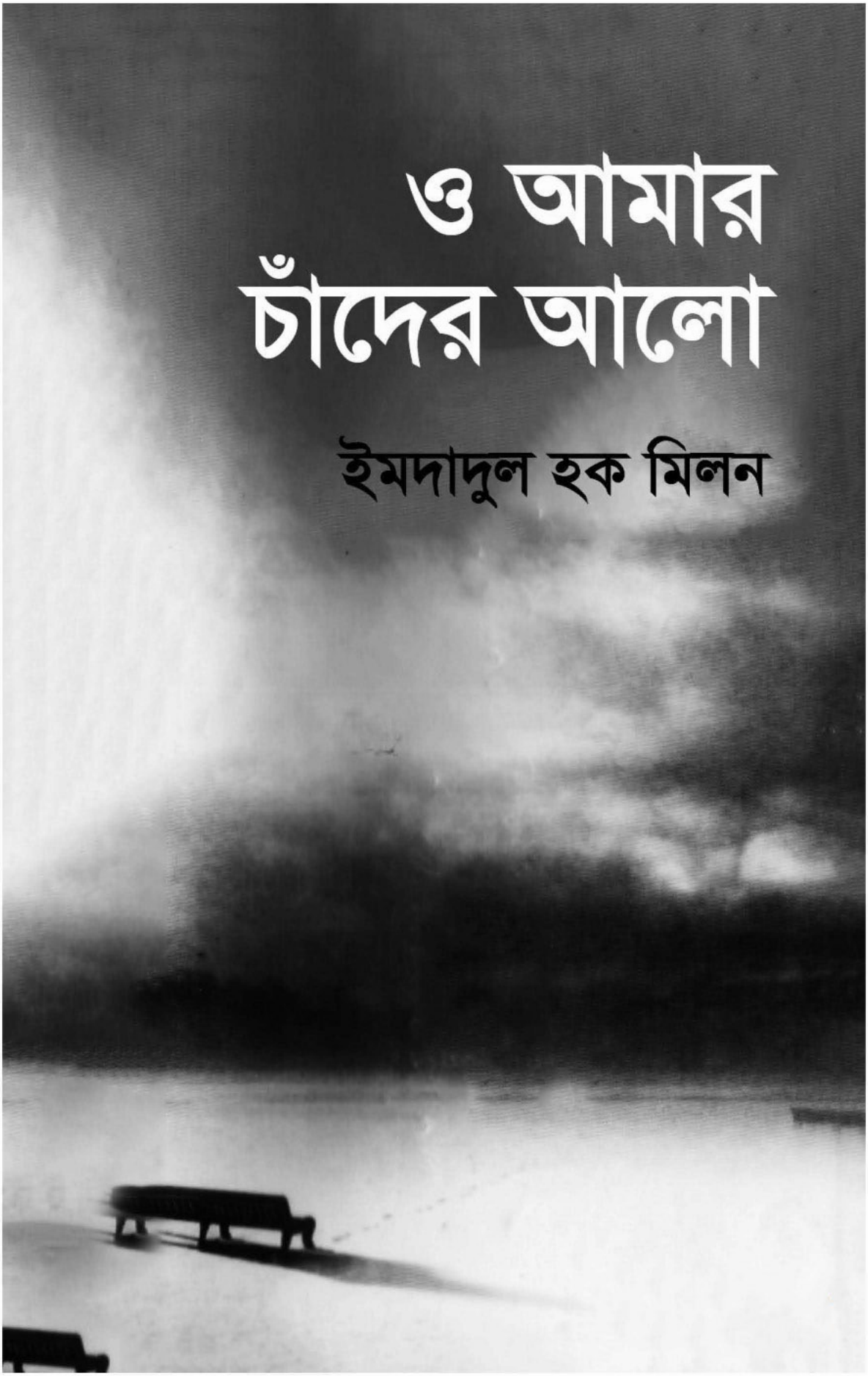

চতুর্থ মুদ্রণ | একুশের বইমেলা ২০০৪
তৃতীয় মুদ্রণ | একুশের বইমেলা ২০০৩
দ্বিতীয় মুদ্রণ | একুশের বইমেলা ২০০৩
প্রথম মুদ্রণ | একুশের বইমেলা ২০০৩

© | লেখক

প্রচ্ছদ | মাসুম রহমান

কম্পিউটার গ্রাফিক্স | লিটিল এম

প্রকাশক | মাজহারুল ইসলাম
অন্যপ্রকাশ
৩৮/২-ক, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৫৮০২
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯৬৬৪৬৮১

মুদ্রণ | কালারলাইন প্রিন্টার্স
৬৯/এফ গ্রীনরোড, পান্থপথ, ঢাকা

মূল্য | ৮০ টাকা

আমেরিকা পরিবেশক | মুক্তধারা
জ্যাকসন হাইট, নিউইয়র্ক

কানাডা পরিবেশক | অন্যমেলা
২৯৮৬, ড্যানফোর্থ এভিনিউ, টরোন্টো

যুক্তরাজ্য পরিবেশক | সঙ্গীতা লিমিটেড
২২ ব্রিক লেন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য

O Amar Chander Alo | By Imdadul Haque Milon
Published by Mazharul Islam, Anyaprokash
Cover Design : Masum Rahman
Price : Tk. 80 only
ISBN : 984 868 215 5

উৎসর্গ

ইবনে হাসান খান

আমাদের প্রিয় হাসানকে

অ ন্য প্র কা শ

প্রকাশিত

লেখকের অন্যান্য বই

কুসুমের মতো মেয়েরা

স্বপ্নে দেখা মুখ

মেয়েটি এখন কোথায় যাবে

উপন্যাস সমগ্র-১

নির্বাচিত প্রেমের উপন্যাস

অন্তরে

প্রিয়

একান্ত

মিলন হবে কত দিনে

মন ছুঁয়ে যায় ভালোবাসা

বহুদূর

ভুল

হে বন্ধু হে প্রিয়

স্বপ্ন

অপরিচিতা

আমি কি স্বপ্ন দেখছি ?

মনজুর পরনে বিসকিট রঙের প্যান্টের ওপর খয়েরি রঙের পুরনো পানজাবি। তার ওপর খাকি রঙের একখানা চাদর। ক্লান্ত বিষণ্ন মুখখানায় চার-পাঁচদিনের দাড়ি-গোঁফ। ভাঙাচোরা বাড়িটার নড়বড়ে দরজা খুলে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিল সে। নিজের অজান্তেই যেন কথাটা বলে ফেলেছিল।

লুবানা মিষ্টি করে হাসল। না, স্বপ্ন নয়। বাস্তব।

লুবানার পরনে বেগুনি রঙের আমেরিকান জর্জেট। আগের তুলনায় অনেক অনেক বেশি সুন্দর হয়েছে সে। মুখের দিকে তাকালে চোখ ফেরানো যায় না।

মনজুও চোখ ফেরাতে পারছে না।

মনজুকে ওভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে আবার হাসল লুবানা। তারপর ডান হাতটা মনজুর দিকে বাড়িয়ে দিল। এই যে আমার হাত। এই হাত তুমি ধর। ধরলেই বুঝতে পারবে কতটা বাস্তব আমি।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো লুবানার হাত ধরল মনজু। বলল, আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না। সত্যি তুমি ?

সত্যি আমি।

তুমি কবে দেশে এসেছ ?

আজ তিনদিন।

আমাদের এই বাড়ির ঠিকানা কোথায় পেলে ?

এই প্রশ্নের জবাব দিল না লুবানা। বলল, ভেতরে যেতে বলবে না ?

মনজু যেন একটু লজ্জা পেল। তাই তো! তোমাকে দেখে এতটাই অবাক হয়েছি, বুঝতেই পারছি না কী করব!

প্রথমে বলল, [illegible] এসো

মনজু হাসল। বলছি। এসো, ভেতরে এসো।

মনজুর হাত ধরে ভেতরে ঢুকল লুবানা।

বসার ঘরে তাকে বসাল মনজু। একটু বস। মাকে বলে আসি।

লুবানা কিছু বলার আগেই ভেতর দিকে চলে গেল মনজু। সে জানে মা এখন রান্নাঘরে। সাড়ে এগারোটা বাজে। দুপুরের রান্না নিয়ে ব্যস্ত হয়েছেন মা।

কিন্তু মায়ের সামনে এসেই হাঁপাতে লাগল মনজু। কাশতে লাগল।

মনজুকে অমন করতে দেখে ব্যতিব্যস্ত হলেন মা। রান্না রেখে দু'হাতে ছেলেকে জড়িয়ে ধরলেন। ব্যাকুল গলায় বললেন, কী হলো? এমন করছিস কেন?

না কিছু না। কিছু না।

শরীর কি বেশি খারাপ লাগছে?

না।

শ্বাসকষ্ট বেড়েছে, নাকি আবার জ্বর আসছে?

মনজু ক্লান্ত বিষণ্ন ভঙ্গিতে হাসল। না, ওসবের কিছুই না মা।

তাহলে এমন করছিস কেন?

শরীরটা দুর্বল তো, এজন্য একটু হাঁটাচলা করলেই এমন লাগে।

তাহলে হাঁটাচলা করছিস কেন? শুয়ে থাকছিস না কেন?

মায়ের এই কথার ধার দিয়েও গেল না মনজু। বলল, মা, লুবানা এসেছে, লুবানা।

শুনে অবাক হলেন মা। লুবানা কে?

লুবানার কথা তোমার মনে নেই?

না।

গেণ্ডারিয়ার যে বাড়িতে বাবা মারা গেলেন...

এবার চিনতে পারলেন মা। উৎফুল্ল হলেন। বুঝেছি, বুঝেছি। সেই বাড়িঅলার বড়মেয়ের মেয়ে।

হ্যাঁ।

তোর বাবা মারা যাওয়ার পর মেয়েটিকে তুই কিছুদিন পড়িয়েছিলি।

মনজু খুশি হলো। এই তো তোমার মনে পড়েছে। ও তখন ক্লাশ সেভেনে না এইটে যেন পড়ে।

ওর বাবা বিদেশে থাকতেন না ?

হ্যাঁ। লন্ডনে। ও আর ওর মা থাকতেন ওই বাড়িতে।

পরে তো ওরাও লন্ডনে চলে গেল। এতদিন পর কোত্থেকে এল ?

নিশ্চয় লন্ডন থেকে। তবে ওর সঙ্গে এখনও তেমন কথা হয়নি। ড্রয়িংরুমে বসিয়ে রেখে এসেছি। তুমি আমাদেরকে দু'কাপ চা দিও।

মা স্নিগ্ধমুখে হাসলেন। যা, আমি নিয়ে আসছি।

মনজু আবার এসে বসার ঘরে ঢুকল।

লুবানা বসে আছে বেতের বড় সোফাটায়। মনজু তার মুখোমুখি বসল।

লুবানা বলল, আচ্ছা, আমাকে চিনতে তোমার অসুবিধা হয়নি ?

না, না তো।

মানে আমি কি তেমন বদলাইনি ?

অনেক বদলেছ।

তাহলে ?

তবু চিনতে অসুবিধা হয়নি।

কেন বল তো ?

কিছু কিছু মানুষ আছে যাদের চেহারা বদলে গেলেও কিছু কিছু মানুষের চোখে সেই বদলটা ধরা পড়ে না।

কথার শেষ দিকে এসে দু'তিনবার কাশল মনজু। তারপর হাঁপাতে লাগল।

মনজুকে এমন করতে দেখে চিন্তিত হলো লুবানা। তোমার কী হয়েছে ? এমন করছ কেন ?

নিজেকে সামলাল মনজু। আমি একটু অসুস্থ।

কী হয়েছে ?

এজমা আছে তো, মাঝে মাঝেই শ্বাসকষ্ট হয়।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। আবার ক'দিন খুব জ্বরে ভুগলাম।

হ্যাঁ, তোমাকে খুবই সিক দেখাচ্ছে।

একটু থামল লুবানা। তারপর মিষ্টি করে হাসল। তবু তোমাকে দেখে খুব ভাল লাগছে আমার। খুব ভাল লাগছে।

দু'কাপ চা এবং কোয়ার্টার প্লেটে কয়েকটি বিসকুট একটা ট্রেতে নিয়ে মা এসে ঢুকলেন বসার ঘরে।

মাকে দেখেই বিনীত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল লুবানা।

ট্রেটা সেন্টার টেবিলের ওপর রাখলেন মা।

মনজু বলল, মা, এ হচ্ছে লুবানা।

লুবানা এগিয়ে গিয়ে মাকে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করল।

মা বললেন, বেঁচে থাক মা, বেঁচে থাক।

মনজু বলল, দেখ তো মা, লুবানার চেহারা তেমন বদলেছে কি না!

ডান হাতে গভীর মমতায় লুবানার চিবুক তুলে ধরলেন মা। মুগ্ধ চোখে লুবানার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, অনেকটাই আগের মতো আছে চেহারা। তবে আগের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর হয়েছে। আর লন্ডনে থাকার পরও বাঙালিই আছে।

একটু থামলেন মা। তারপর বললেন, বস মা, বস। চা খাও।

লুবানা বলল, আপনিও বসুন।

আমার মা বসার এখন সময় নেই।

কেন?

রান্না চুলোয়।

ও।

লুবানার মাথায় হাত বুলিয়ে মা বললেন, আমাদের মতো মানুষদের তুমি যে মনে রেখেছ, দেখা করতে এসেছ, খুব খুশি হয়েছি মা। খুব খুশি হয়েছি। তুমি কিন্তু দুপুরে খেয়ে যাবে। না করতে পারবে না।

মনজু বলল, কী বলছ মা. আমাদের এইসব দরিদ্র খাবার ও খেতে পারবে,

লুবানা চোখ পাকিয়ে মনজুর দিকে তাকাল। এভাবে কথা বলবে না।

তারপর মায়ের হাত ধরল। খালাম্মা, আমি খেয়ে যাব।

মা খুশি হলেন। সত্যি?

সত্যি। আপনার হাতের খাবার না খেয়ে আমি যাব না।

ঠিক আছে মা, ঠিক আছে। এখন তাহলে চা খাও।

জি আচ্ছা।

মা চলে যাওয়ার পর চায়ে চুমুক দিল লুবানা। মনজুর দিকে তাকিয়ে বলল, এই তুমি কি একটা জিনিস খেয়াল করেছ?

মনজুও চায়ে চুমুক দিল। হাসল। করেছি।

লুবানা অবাক হলো। কী বল তো?

তুমি আমাকে তুমি করে বলছ?

লুবানা মিষ্টি করে হাসল। হ্যাঁ, তুমি যখন আমাকে পড়াতে তখন বলতাম মনজু ভাই।

মনে আছে।

স্যার কিন্তু কখনও বলিনি।

তাও মনে আছে।

আর...

কথাটা শেষ করল না লুবানা।

মনজু বলল, আর?

আর তোমাকে কখনও ভুলিনি।

অপলক চোখে লুবানার দিকে তাকিয়ে রইল মনজু।

লুবানা বলল, অনেকগুলো বছর কেটে গেছে কিন্তু তোমাকে আমি মনে রেখেছি।

মনজু স্নিগ্ধ গলায় বলল, তা বুঝতে পারছি। কিন্তু আমাদের এই বাড়ির ঠিকানা তুমি কোথায় পেলে?

ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়।

উপায়টা কীভাবে হলো?

লন্ডনে থেকেই আমার মায়ের চাচার বাড়িতে ফোন করে আমার এক মামাকে মানে তুমি তো চেনই, আমার বাবলু মামাকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম, সে জোগাড় করে দিয়েছিল।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। একবার ভাবলাম তোমাকে চিঠি লিখি। তারপর ভাবলাম, না, সরাসরি চলে আসি। এসে তোমাকে একটু চমকে দিই।

চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে মনজু আবার অপলক চোখে তাকিয়ে রইল লুবানার দিকে।

লুবানাও তাকিয়েছিল।

দোকানে কারে থুইয়াইলা ?

দুলারির এই ভাষাটা বহুকাল ধরে শুনে আসছে হাবিব। কিন্তু বহুকাল ধরেই অপছন্দ করছে। কখনও কখনও এই নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে একটু ঠাট্টা-মশকরাও করে।

মুডে থাকলে কথা একটু বেশি বলে হাবিব। ঠাট্টা-মশকরা একটু বেশি করে।

আজ দুপুরে মুডে ছিল সে। এজন্য দুলারির প্রশ্নের উত্তর দুলারির ভাষায়ই দিল। কেঐরে থুইয়াহি নাই।

স্বামীর মুখে তার ভাষা শুনে দুলারি একটু থতমত খেল। তারপর হাসল। আইজ মনেহয় খুব মুডে আছ ?

হ আছি।

ক্যালা ?

বিগনিস বহুত ভালা।

দুলারি আবার হাসল। বিতলামি কইরো না। বিহারি মাইয়া হইলে কী হইব, আমি তো লেখাপড়া করছি বাংলা ইশকুলেই। ইংরাজি বি জানি। বিগনিস না, কথাটা হইল বিজনিস।

আরে ছাবাছ। হাচাঐ দেহি ইংরাজি জানো।

তোমার লাহান বিএ পাস না হইবার পারি, কেলাস নাইন তরি তো পড়ছি।

পইড়া ভালা করছ। অহন খাওন দেও।

তারপরই ছেলের কথা মনে পড়ল হাবিবের। সঙ্গে সঙ্গে সিরিয়াস হয়ে গেল সে। নিজস্ব ভাষা বেরিয়ে এল। বিজু কোথায় ? ফেরেনি এখনও ?

না আহে নাই তো ?

এখনও আসেনি কেন ? কোথায় গেছে ?

জানো না কই গেছে ?

জানি, কোচিংয়ে গেছে। কিন্তু সেখান থেকে একটার মধ্যে ফেরার কথা। এখন দুটো পাঁচ বাজে।

মনে হয় কুচিং শেষ অহে নাই। আর তোমার পোলা তো পড়ালেখার নামে ওস্তাদ। নাওন খাওন ভুইলা পড়ালেখা করে।

আজকালকার দিনে এটা যে আমার কত বড় সৌভাগ্য সেটা আমি ছাড়া আর কেউ জানে না।

ক্যালা ?

এই তুমি এত ক্যালা ক্যালা করো না। শুনলে মনে হয় ক্যালা নয় বলছ কেলা ? কেলা মানে হলো কলা। পাঁচ ছ'প্রকারের কলার নাম আমি জানি। সাগরকলা শবরিকলা চম্পাকলা বিচিকলা।

আর একহান বি আছে। কাচকলা।

শুনে হাসল হাবিব। আজ তো মনে হয় তুমিও মুডে আছ। কথাবার্তা সমান তালে চালিয়ে যাচ্ছ।

দুলারিও হাসল। শইলডা ভালা তো, এর লেইগা মনডাও ভালা।

শরীর ভাল মানে ? হোমিওপ্যাথিতে কাজ হচ্ছে ?

বহুত ভাল কাম হইবার লাগছে। তোমারে আমি কইছিলাম না পাইলসের বিমারে হোমিপ্যাথি ভালা কাম দেয়। আর ডাক্তরহান তো দেহন লাগব। বহুত দামি। পাঁচশো টেকা ভিজিট।

বুঝলাম। তার মানে তোমার অসুবিধাটা কমে গেছে ?

হ একদম কইমা গেছে।

টয়লেট করার সময় ব্লিডিং হচ্ছে না তো।

না। তুমি দেইখো এই ডাক্তারের অষইদ খাইয়া আমার পাইলসের বিমার একদম ভালা হইয়া যাইব। আমার যেই খালায় এই ডাক্তারের কাছে আমারে লইয়া গেছে হেয় একদম ভালা হইয়া গেছে।

ওই খালারও পাইলস ছিল ?

হ। আমার মা খালাগ অনেকেরঐ আছে।

ইস এরকম একটা পাইলসঅলা মহিলা যে আমার বউ হবে এটা আমি কোনওদিন স্বপ্নেও ভাবিনি। আচ্ছা শোন, তুমি যখন আমার সঙ্গে প্রেম করতে তখনও কি তোমার পাইলস ছিল ?

দুলারি হাসল। হ আছিল। তয় তহন এত যনতরনা হইত না।

কিন্তু তোমার যে পাইলস আছে একথা তো তখন আমাকে বলনি।

ওই বেডা, পেরেম করার সমায় কোনও মাইয়ায় কয়নি, হোনো, আমার কইলাম পাইলস আছে।

শরীর-মন ভাল থাকলে হাবিবকে আদর করে কখনও কখনও 'বেডা' বলে দুলারি। শুনতে মজাই লাগে হাবিবের। হাসিও পায়।

এখনও পেল। হাসিমুখে হাবিব বলল, না বলে ভালই করেছ।

কেমুন ভালা ?

আমি যদি জানতাম তোমার পাইলস আছে তাহলে ভাগলভা হয়ে যেতাম।

ভাগলভা কথাটা বুঝল না দুলারি। বলল, কী হইয়া যাইতা ?

ভাগলভা।

বুঝছি। ভাইগা যাইতা।

হ্যাঁ। বিয়ে তো দূরের কথা, প্রেমও করতাম না।

হেইডা আমি বুজছিলাম দেইখাই তো কই নাই।

তার মানে আমার সঙ্গে প্রেম করার জন্য, আমাকে বিয়ে করার জন্য শুরু থেকেই তুমি তৈরি ছিলে ?

ওই বেডা, তুমি তৈয়ার আছিলা না ?

ছিলাম। তবে কম।

না, তুমি আমার থিকা বেশি আছিলা। তোমগ বাড়ির ছাদ থিকা আমগ বাড়ির উডান দেহা যায়। আমার লেইগা রোজঐ ছাদে উটতা তুমি। আমার লগে ফিলডিং মারতা। আমি ইশকুলে যাওনের সমায় রাস্তায় খাড়াই থাকতা। চিডি লেকতা আমারে।

তুমিও লিখেছ। বিহারি হলেও চিঠি তুমি ভালই লিখতে।

হোনও। তোমগ আর আমগ কইলাম অনেক মিল। আমরা বিহার থিকা এই দেশে আইছি, আর তোমরা আইছ কইলকাত্তা থিকা।

হ্যাঁ দুটো ফ্যামিলিই এক অর্থে উদ্বাস্তু। কোলকাতায় আমাদের বিশাল অবস্থা ছিল। গড়িয়াহাটার ওদিকে বিশাল বাড়ি ছিল। আমাদের এই বাড়িটা

পাঁচকাঠার ওপর আর কোলকাতার বাড়িটা ছিল দেড় বিঘার ওপর। পার্টিশানের সময় কোলকাতার বাড়ির সঙ্গে একচেইঞ্জ করে এই বাড়িটা আমরা পেলাম। এটা ছিল এক মধ্যবিত্ত হিন্দুবাড়ি।

আমগটা অমুন বাড়ি না।

আমি জানি। তোমার দাদা তোমার বাপ আর তিনচাচাকে নিয়ে এদেশে এসে ওই বাড়িটা কিনেছিল।

হ। ঠিক কথা।

কিন্তু সবই বদলাল তোমাদের, ভাষাটা বদলাল না কেন? বাড়িতে তো এখনও উর্দু বল তোমরা।

উর্দুও কই, ঢাকাইয়া ভাছাও কই। এইডা কেমতে কেমতে যে হইছে কইবার পারি না।

ভাগ্যিস আমার ছেলেটি তোমাদের ভাষাটা শেখেনি। সে শিখেছে খাঁটি বাংলা ভাষা।

কিন্তু পোলাডা অহনতরি আইতাছে না ক্যালা?

হ্যাঁ ও না এলে তো খেতেও পারছি না। উনিশ বছর বয়সের ছেলে। এই বয়সটা খুব খারাপ। কখন যে বখে যায় ছেলেটা! আর ওর বয়েসি ছেলেরা আজকাল যে হারে ড্রাগ ধরছে। আমার তো ওষুদের দোকান, আমি টের পাই। ছোট্ট ছোট্ট ছেলেরা এসে নানান রকম নেশার ট্যাবলেট চায় জানো।

দুলারি অহঙ্কারী গলায় বলল, আমাগ পোলা ওই রহম হইব না। বাইরে থাকলেবি পড়ালেখা লইয়া থাকে, বাইতে বি পড়ালেখা আর কম্পিউটার।

এজন্য আল্লার কাছে সব সময় শোকর গুজার করবে।

তারপরই লুবানার কথা মনে পড়ল হাবিবের। বলল, আমার ব্রিটিস ভাগ্নিটা কোথায়?

হেইডা তো কইবার পারি না।

মানে? তুমি খবর নিয়েছ? দোতলায় নেই?

না। তুমি দোকানে চইলা যাওনের বাদে আমি দোতালায় গেছিলাম। ভাইয়া অফিসে গেছে গা, শিলা ইনভারসিটিতে, মিলা ইশকুলে। দোতালায় খালি ভাবি, জিগাইলাম লুবানা কো? কইল বাইরে গেছে।

কিন্তু কোথায় গেছে বলে যায়নি?

ভাবি তো কইতে পারল না।

এটা তো চিন্তার কথা। ও বিদেশে থাকা মেয়ে, এদেশের রাস্তাঘাটে আজকাল কতকিছু ঘটে! না না এভাবে চলাফেরা ওর ঠিক হচ্ছে না। এই নিয়ে ওর সঙ্গে আমার কথা বলা উচিত।

দুলারি বলল, আইচ্ছা কইয়ো। অহন ভাত দিমু না পোলার লেইগা বইয়া থাকবা ?

শুধু ছেলের জন্য কেন ? লুবানার জন্যও তো ওয়েট করা উচিত।

ও কি আমগ ঘরে খাইব ?

ওর যখন যে ঘরে ভাল লাগে খাবে, অসুবিধা নেই। ভাইয়ার ওখানেও খেতে পারে, আমার এখানেও। আজ দোকান বন্ধ করে আসার সময় ভেবেছিলাম লুবানা বাড়ি থাকলে সবাই মিলে এক সঙ্গে খাব। বিজু, লুবানা, তুমি আমি।

তয় ইট্টু বহ।

তারপর যেন হঠাৎ মনে পড়েছে এমন গলায় দুলারি বলল, দোকান আইজ বন্ধ কইরা আইছ নি ?

হ্যাঁ।

ক্যালা ? তোমার নতুন কর্মচারীডা কো ? রাজু না কী জানি নাম ?

আছে।

তবে ?

আমার ধারণা ছেলেটা একটু চোট্টা টাইপের। এজন্য ভাবছি ওকে কখনও একা দোকানে বসাব না।

চোট্টা হইলে তো অছুবিদা। ক্যাশ পয়সায় অষইদ বেচব আর চুরি কইরা সাফা করব। কাম নাই অরে রাখনের।

কিন্তু একা আমি দোকানটা চালাই কী করে ?

তাবি কথা।

এসময় বিজু এসে ঢুকল।

জিনস বুট আর টিশার্ট পরা আজকালকার ছেলে। পিঠে ব্যাগ। বেশ লম্বা, বেশ সুন্দর ছেলে বিজু। অত্যন্ত স্মার্ট। বিজুর স্বভাব হচ্ছে সাধারণত কথা খুব একটা বলে না। কিন্তু কাউকে ভাল লাগলে তার সঙ্গে মোটামুটি কথা সে বলে। আর বেশির ভাগ সময়ই গম্ভীর। হাবিব এবং দুলারি দুজনেই কেমন যেন সমীহ করে চলে তাকে।

এখনও তেমন একটা ব্যাপারই হলো।

বিজু এসে ঢোকার পরই হাবিব এবং দুলারি কী রকম তটস্থ হয়ে উঠল।

হাবিব বলল, তুমি কি গোসল করে বেরিয়েছিলে বাবা?

বিজু মৃদু গলায় বলল, হুঁ।

দুলারি বলল, তাইলে হাত মুখ ধুইয়া আস। খাওন রেডি করি।

বিজু এবারও বলল, হুঁ।

তারপর নিজের রুমে চলে গেল।

বিজু চলে যাওয়ার পর হাবিব ফিসফিসে গলায় দুলারিকে বলল, এত গম্ভীর হয়ে আছে কেন?

কইবার পারি না।

অবশ্য ছেলেটা তো এমনই। ঠিক আছে যাও, তুমি খাবার রেডি কর।

দুলারি ডাইনিংরুমের দিকে যাচ্ছে, হাবিব ডাকল। শোন।

দুলারি ঘুরে দাঁড়াল। কও।

পুরনো ম্যাক্সিটা পরাতে তোমাকে খুবই স্লিম লাগছে।

শুনে হাসল দুলারি। আবার বিতলামি?

না না ঠাট্টা না, সত্যি।

আসলে মেচকি পরনে আমারে বেশি ফেটি লাগতাছে, এর লেইগা বিতলামি কইরা তুমি কইলা আমারে ছিলিম লাগতাছে।

এটা তুমি তাহলে বুঝেছ?

বুজুম না ক্যালা? আমি কি ছাও নিহি?

তাহলে ওজন কমাবার চেষ্টা কর। রোজ বিকেলে ছাদে গিয়ে হাঁট। দু'বেলা রুটি সবজি খাও। কম ঘুমাও।

আইচ্ছা।

কিন্তু হাবিব জানে দুলারির এই রাজি হওয়া আসলে রাজি হওয়া নয়। কথা এককান দিয়ে ঢোকে তার আরেক কান দিয়ে বেরিয়ে যায়। এটাই স্বভাব। আজ একুশ বছর ধরে দেখছে হাবিব।

মনজুদের খাবার টেবিলটা গোলাকার।

তবে অনেকদিনের পুরনো। নড়বড়ে ধরনের। টেবিলের ওপর সবুজের কাছাকাছি রঙের নরম ধরনের রেকসিনের টেবিলক্লথ বিছানো।

এই টেবিলে খেতে বসেছে মনজু আর লুবানা।

তিনটে মাত্র আইটেম। কুচো চিংড়ি দিয়ে উচ্ছে ভাজি, পুকুরে চাষ করা পাঙাস মাছের সঙ্গে আলু আর ডাল। ডালের ওপর কালচে রঙের ভাজা পেঁয়াজের টুকরো ভাসছে। রঙ দেখেই বোঝা যায় ডালটার বেশ স্বাদ হয়েছে।

টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে লুবানাকে খাবার তুলে দিচ্ছিলেন মা।

লুবানা মুগ্ধ চোখে মাকে দেখছিল।

একসময় বলল, এত আদর করে কেউ আমাকে কোনওদিন খাওয়ায়নি।

মা একটু অবাক হলেন। কেন মা?

কে খাওয়াবে?

তুমি তো একমাত্র মেয়ে, তোমার মা-বাবা তোমাকে আদর করেন না?

লুবানা হাসল। আদর করার সময় পাবে কোথায়?

মানে?

লন্ডনে আমাদের দুটো রেস্টুরেন্ট। একটা বাবা চালায়, একটা মা।

তাই নাকি?

জি। সকালবেলা উঠে আমরা তিনজন মানুষ তিনদিকে চলে যাই। মা-বাবা তাদের রেস্টুরেন্টে আর আমি কলেজে।

প্লেটে ভাত মাখাতে মাখাতে মনজু বলল, বিদেশের জীবনটা খুব কষ্টের।

লুবানা মনজুর দিকে তাকাল। কষ্টের না বলে বল পরিশ্রমের।

তাই ?

হ্যাঁ। তুমি যত পরিশ্রম করবে তত সুখে থাকবে।

জীবনটা নিশ্চয় খুব যান্ত্রিক ?

খুবই যান্ত্রিক। মানুষের জন্য মানুষের একেবারেই মায়া-মমতা থাকে না।

তারপরই অবাক হলো লুবানা। মনজু ভাত নাড়াচাড়া করছে কিন্তু খাচ্ছে না। বলল, কী হলো ? খাচ্ছ না কেন ?

মনজু কথা বলবার আগে মা মনজুকে বললেন, আজ খেয়ে নে বাবা। আজ আমার জন্য অপেক্ষা করার দরকার নেই।

ব্যাপারটা বুঝল না লুবানা। বলল, মানে ? কিসের অপেক্ষা ?

মনজু লাজুক ভঙ্গিতে হাসল। আমি মাকে ছাড়া খাই না।

বল কী ?

হ্যাঁ। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে আমাদের দুজনার তো আর কেউ নেই, এজন্য আমাদের যাবতীয় সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনা দুজনে ভাগ করে নিই।

মায়ের দিকে তাকাল মনজু। মা, তুমি আমার পাশে বস। খেয়ে নাও।

এসব কথা শুনে লুবানার কী রকম ঘোর লেগে গেছে। খাবার কথা ভুলে অবাক বিস্ময়ে মানুষ দুজনকে দেখছিল সে।

মা তখন নিজের প্লেটে খাবার নিচ্ছেন। খাবার নিতে নিতে লুবানার দিকে তাকালেন। এমন পাগল ছেলে আজকালকার দুনিয়াতে আছে, বল তো মা ? এই বয়সী ছেলে মায়ের জন্য এত কাতর থাকে!

তারপর মনজুর দিকে তাকালেন তিনি। এই, আমি মরে গেলে কী করবি তুই ?

মনজু সঙ্গে সঙ্গে রেগে গেল। আমি কিন্তু খাব না মা। আমি কিন্তু উঠে যাব।

মা স্নিগ্ধ গলায় বললেন, পাগলামো করিস না। আমি খাচ্ছি।

মনজুর পাশের চেয়ারটায় বসলেন মা।

তখনও ঘোর কাটেনি লুবানার। আগের মতোই অবাক বিস্ময়ে মা এবং ছেলেকে দেখছিল সে।

খাওয়া-দাওয়ার পর আবার বসার ঘরে এসে বসেছে মনজু আর লুবানা।

লুবানা বলল, তুমি কি পড়াশুনো শেষ করেছিলে ?

হ্যাঁ।

মাস্টার্স করেছ ?

করেছি।

সাবজেক্ট ?

ইংরেজি লিটারেচার।

বল কী ?

মনজু হাসল। কেন ? এতে অবাক হওয়ার কী হলো ?

না মানে খুব ভাল সাবজেক্ট তো!

যত ভাল সাবজেক্টই হোক, আমার তো কোনও লাভ হয়নি।

মানে ?

মাস্টার্স করার পর অনেক চেষ্টা করেছি, কোথাও চাকরি হয়নি।

কেন ?

কী করে বলব! বোধহয় আমার ভাগ্য খারাপ।

তাহলে তুমি এখন কী করছ ?

টিউশনি।

শুধুই টিউশনি ?

হ্যাঁ।

মনজু একটু উদাস হলো। এমনিতেই এজমার রোগী। তার ওপর অনেকগুলো টিউশনি। শরীরটা বেশ খারাপ হয়ে গেছে।

লুবানা মায়াবী গলায় বলল, তোমাকে দেখে, তোমার কথা শুনে, তোমার জন্য আমার খুব মায়া লাগছে।

মনজু ম্লান হাসল। আমাকে নিয়ে ভেব না।

লুবানা সঙ্গে সঙ্গে বলল, তাহলে কাকে নিয়ে ভাবব ?

না মানে আমার চেয়েও কষ্টে আছে কত মানুষ!

তা থাক। তাদের নিয়ে আমি ভাবছি না।

তবে একটা কারণে আমি খুবই সুখী।

কী ?

আমার কাছে আমার মা আছেন। মায়ের মুখটা দেখলে, মাকে একটু ছুঁয়ে দিলে শ্বাসকষ্ট কিংবা টিউশনির ক্লান্তি কোওটাই আমার থাকে না।

মনজু তার স্বভাব মতো আবার হাসল। এই দেখ, শুধুই নিজের কথা বলে যাচ্ছি। তোমার কথা বল। শুনি।

লুবানার মুখে রহস্যময় একটা হাসি ফুটল। আমার কথা বলব ?

হ্যাঁ নিশ্চয়।

আমি তো বাইরে থাকা মানুষ! আমার কথা যে একটু সরাসরি।

তাতে কী হয়েছে ?

তুমি আমাকে ভুল বুঝবে না তো ?

না না ভুল বুঝব কেন ?

বুঝতে পার।

না তুমি বল। বল তুমি।

তার আগে আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দাও।

কী ?

তুমি কি কাউকে ভালবাস ?

মনজু খুবই বিব্রত হলো, তারপর হাসল। বাসি।

লুবানা চমকাল। কাকে ?

আছে একজন মানুষ। তাকে আমি খুব ভালবাসি। আমার জীবনের চেয়েও বেশি ভালবাসি।

মনজুর কথা শুনে লুবানা কেমন হাঁপ ছাড়ল। আমি জানি তিনি কে ?

বল তো ?

তোমার মা।

ঠিক।

আমি তাঁর কথা জানতে চাইনি।

তাহলে ?

তুমি নিশ্চয় বুঝেছ ?

হ্যাঁ বুঝেছি।

বল তাহলে।

মা ছাড়া আমার আর কেউ নেই।

সত্যি ?

সত্যি। তাছাড়া আমার মতো হতদরিদ্র, অসুস্থ একজন মানুষকে কে ভালবাসবে বল ?

লুবানা হাসিমুখে উঠে দাঁড়াল। আমি আমার উত্তর পেয়ে গেছি।

লুবানাকে উঠতে দেখে মনজুও উঠল। তাই ?

তাই। শোন, আমি এখন যাব।

আর একটু বস না!

না আজ না। উঠেছি তো নানার বাড়িতে। সেই গেণ্ডারিয়ায়। যেতে অনেকটা সময় লাগবে। তবে আরেকটা কথা আছে।

বল।

কাল সকালে আমি আবার আসব।

সত্যি ?

সত্যি। তুমি রেডি হয়ে থাকবে।

কেন ?

তোমাকে নিয়ে আমি একটা জায়গায় যাব।

কোথায় ?

এখনও আমি তা জানি না। চল আমাকে রিকশায় তুলে দাও।

লুবানার সঙ্গে রাস্তায় এল মনজু। রিকশা ঠিক করল।

রিকশায় চড়ে লুবানা বলল, কাল দেখা হবে।

মনজু হাসল। ঠিক আছে।

বিজুর কম্পিউটারটা এমন জায়গায়, কম্পিউটারের সামনে বসলে বিজুর বাঁ পাশে জানালা, ডানপাশে খানিকদূরে দরজা। গেণ্ডারিয়ার সাবেক শরাফতগঞ্জ লেনের এই বাড়িটা পুরনো আমলের। ফলে রুমগুলো বড় বড়, মাথার ওপরকার ছাদ বেশ উঁচুতে এবং ছাদের তলায় লোহার বিম আছে। বিমের ফাঁক ফোকড়ে চড়ুই পাখি এসে বাসাও বাঁধে। খড়কুটো এবং বিষ্ঠায় নষ্ট করে ঘরের মেঝে।

যদিও বিজুর রুমে বাসা বাঁধেনি, তবু ব্যাপারটা বিজুর জানা। অন্যান্য রুমে প্রায়ই চড়ুই উৎখাত অভিযান চলে।

কিন্তু এই বাড়িটা ভাল লাগে না বিজুর। রুম বারান্দা দোতলায় ওঠার সিঁড়ি বাথরুম টয়লেট কোনও কিছুই ভাল না। কিচেন কলতলা সব এতই সেকেলে, বিচ্ছিরি লাগে বিজুর।

বিজুর দাদা বেঁচে থাকতেই এই বাড়ি চার ভাগ করে গেছেন। দোতলা এবং নিচতলায় চওড়া বারান্দার মাঝখানে কোনও রকমে ইট গেঁথে একটা দেয়াল করেছেন। দেয়ালের মাঝখানে যেনতেন একখানা দরজা। অর্থাৎ দুটো ফ্ল্যাট। নিচতলার ফ্ল্যাট দুটোর সামনের দিকটা বিজুদের, ওপাশেরটা ছোটফুফুর।

বিজুর ছোটফুফু অবশ্য এই বাড়িতে থাকে না। থাকে শ্বশুরবাড়িতে। মিরপুর দশ নম্বরে। ফ্ল্যাটটা চারহাজার টাকায় ভাড়া দেয়া। মাসে মাসে এসে ভাড়া নিয়ে যায়। টাকা-পয়সার ব্যাপারে বিজুর ছোটফুফুটা খুবই কঞ্জুস টাইপের। একটা পয়সাও ছাড়ে না, কাউকে দু'দশটা টাকা দেয়ও না।

বড়ফুফুটা অবশ্য অন্যরকম। লুবানার মা। থাকেন লন্ডনে। নিচেরতলায় ছোটফুফুর ফ্ল্যাটের ঠিক ওপরের অংশটা তার। সেটার ভাড়াও চারহাজার টাকা। কিন্তু ভাড়ার টাকাটা ফুফু নেন না। বড়ভাই হাসনাতকে দিয়ে দেন।

হাসনাত চাকরিজীবী মানুষ। দুইমেয়ে নিয়ে সংসার চালানো মুশকিল দেখে

ফুফু তাকে ভাড়ার টাকাটা নিয়ে নিতে বলেছেন। ফলে মোটামুটি স্বচ্ছলভাবে চলতে পারে সে।

এদিকে বিজুর বাবা ওষুদের বিজনেস করে ভালই আছে। তবু বড়বোন তাকে বিজনেসের জন্য একবার দু'লাখ টাকা দিয়েছিলেন। সেই টাকা ফুলে ফেপে ভালই দাঁড়িয়েছে এতদিনে। কিন্তু টাকাটা ফুফু ফেরত চান না। বাবাও দেয়ার নাম করে না।

বিজু এসব জানে।

বিজুর চাচা-ফুফুদের হিসেবটা হলো প্রথমে বড়চাচা হাসনাত, তারপর লুবানার মা তারপর বিজুর বাবা তারপর ছোটফুফু।

দাদা বেঁচে থাকতেই বড় দুই ছেলেমেয়েকে দিয়ে গেছেন ওপরতলা, ছোট দুজনকে নিচতলা। বাড়ির ট্যাক্স, ইলেকট্রিসিটি গ্যাস পানি এসবের বিল একসঙ্গেই আসে। মিটার টিটার আলাদা করা হয়নি। যাই আসে সেটা চারভাগ হয়। দুভাগ হাসনাত সাহেব দেন, বাকি দু'ভাগ বিজুর বাবা আর ছোটফুফু।

মোটামুটি ঝামেলাহীন জীবন বিজুদের। তবু এই বাড়িটা ভাল লাগে না তার। এখানে থাকতে ইচ্ছে করে না। বাবাকে বলেছে বড়ফুফুকে বলে যেমন করে হোক বিজুকে যেন সে লন্ডনে পাঠিয়ে দেয়।

ক'দিন ধরে ভাবছে লুবানাকেও বলবে। কম্পিউটার এক্সপার্ট তো বিজু হয়েই গেছে। এখন টোফেল ইত্যাদি করে ইংল্যান্ডের কোনও একটা ইউনিভার্সিটিতে এডমিশান নেবে, তারপর সেখানে চলে যাবে। লুবানা নিশ্চয় এ ব্যাপারে তাকে অনেক হেলপ করতে পারবে।

আজ দুপুরের পর কম্পিউটারের সামনে বসে এসব ভাবছে বিজু, হঠাৎই জানালার দিকে তাকিয়েছে, তাকিয়ে দেখে পাশের বাড়ির দোতলার বারান্দায় আইরিন দাঁড়িয়ে আছে।

বিজুকে তাকাতে দেখেই মিষ্টি করে হাসল সে।

আইরিন খুব সুন্দর মেয়ে, খুব মিষ্টি মেয়ে। মনিজা রহমান গার্লস স্কুলে ক্লাশ নাইনে পড়ে।

কিন্তু নাইনের ছাত্রী হিসেবে তাকে দেখায় বেশ বড়সড়। লম্বা, স্লিম। টুকটুকে ফর্সা। স্কুলের ফাংশানে একদিন তাকে শাড়ি পরে যেতে দেখেছিল বিজু। দেখে প্রথমে বুঝতেই পারছিল না যে এটা আইরিন। এত বড় দেখাচ্ছিল তাকে।

শাড়ি পরলে মেয়েরা যে কেন হঠাৎ করে এমন বড় হয়ে যায়।

কিন্তু বিজুকে কম্পিউটারের সামনে বসতে দেখলেই আইরিন যে কেন এসে তাদের বারান্দায় দাঁড়ায়! কেন যে বিজুকে দেখে হাসে, বিজু এই রহস্যের অর্থই বোঝে না।

তবে বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে বিজুর। কম্পিউটারে আর মন বসতে চায় না। চোখ বারবার চলে যায় আইরিনের দিকে।

আজও তেমন হচ্ছিল।

আড়চোখে বারবারই আইরিনের দিকে তাকাচ্ছিল বিজু।

এসময় অদ্ভুত একটা কাজ করল আইরিন। কানের সামনে হাত তুলে টেলিফোনের ইঙ্গিত করল। আর নিঃশব্দে ঠোঁট নেড়ে কী যেন বলার চেষ্টা করল।

প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতে পারল না বিজু। ফ্যালফ্যাল করে আইরিনের দিকে তাকিয়ে রইল।

আইরিন আবার আগের ইশারাটা করল।

এবার ব্যাপারটা বুঝল বিজু। আইরিন তাকে ফোন করতে বলছে অথবা আইরিন নিজে তাকে ফোন করবে!

কিন্তু বিজু তো আইরিনদের ফোন নাম্বার জানে না! সে কী করে আইরিনকে ফোন করবে!

আইরিন কি জানে বিজুদের ফোন নাম্বার ?

বিজু নিজেও ইশারায় আইরিনকে ব্যাপারটা বোঝাতে চাইল। মেয়েরা বোধহয় এসব ক্ষেত্রে ছেলেদের চে' অনেকটা এগিয়ে থাকে। বিজুর ইশারার অর্থ একবারেই বুঝে গেল আইরিন। স্বভাব সুলভ মিষ্টি ভঙ্গিতে হাসল সে। তারপর ইশারায় বিজুকে বোঝাল বিজু যেন এখন টেলিফোনের সামনে যায়। আইরিন ফোন করবে।

বিজুদের টেলিফোনটা বসার ঘরে। সেই ঘরে এখন কেউ নেই। মা-বাবা দুজনেই বেডরুমে। দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর ঘণ্টাখানেকের একটা ঘুম দেয়ার অভ্যেস আছে মা-বাবা দুজনারই। এটাকে বলে ভাতঘুম। দুজনেই এখন সেই ভাতঘুমে আছে। সুতরাং বসার ঘরে গিয়ে অনায়াসেই টেলিফোনটা এখন ধরতে পারবে বিজু।

অবশ্য মা-বাবা টেলিফোন বাজার শব্দ পেলেও অসুবিধা নেই। বিজুকে তো তার বন্ধুবান্ধবরা টেলিফোন করেই।

বিজু বসার ঘরে এল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাজল টেলিফোন। বিজু টেলিফোন তুলে বলল, হ্যালো।

ওপাশে নরম কিন্তু স্নিগ্ধ হাসিমাখা গলায় আইরিন বলল, আমি।

আমাদের ফোন নাম্বার তুমি কোথায় পেলে?

পাশের বাড়ির ফোন নাম্বার পাওয়া কি কঠিন?

কী জন্য ফোন করেছ?

তুমি বোঝনি?

না।

তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্য।

কী কথা?

অনেক কথা।

বল।

কিন্তু বলতে আমার খুব লজ্জা করছে।

শুনে বিজু হাসল। তাহলে বল না।

কিন্তু বলতে আবার ইচ্ছেও করছে।

তাহলে বল।

তার আগে বলে নিই, আমি খুব লুকিয়ে লুকিয়ে ফোন করেছি। যে ঘরে ফোন সেই ঘরে এখন কেউ নেই। যদি এসে পড়ে তাহলে আমি কিন্তু ফোন রেখে দেব।

আচ্ছা।

এই ফাঁকে তুমি কি আমাদের ফোন নাম্বারটা লিখে নেবে?

তাতে লাভ কী?

আমাকে তুমি ফোন করবে?

ফোন যদি অন্য কেউ ধরে আমি কি তাহলে তোমাকে চাইব?

আরে না।

তাহলে?

অন্য কেউ ধরলে সঙ্গে সঙ্গে ফোন রেখে দেবে। আমি ধরলে কথা বলবে।

ঠিক আছে নাম্বারটা বল।

আইরিন তাদের ফোন নাম্বার বলল। নাম্বারটা মুখস্থ করে ফেলল বিজু।

গুড।

কিন্তু পার্কে গিয়ে কী করবে তুমি ?

লুবানা হাসল। তা তোকে বলা যাবে না।

কেন ?

এই কেনরও উত্তর দেয়া যাবে না।

আচ্ছা তাহলে দিও না। এখন অন্যকিছু কথার উত্তর দাও।

বল।

তার আগে বল, খেয়েছ ?

হ্যাঁ। অসাধারণ খাবার খেয়েছি আজ। কী খাবার, কোথায় খেয়েছি, কাদের সঙ্গে তাও তোকে বলা যাবে না।

বিজু তীক্ষ্ণচোখে লুবানার দিকে তাকাল। তোমার আজ কী হয়েছে ? মনে হয় খুবই আনন্দে আছ ?

তা আছি। তোকে একদিন সব বলব। কারণ তোর সাহায্য আমার লাগবে।

আমারও লাগবে তোমার সাহায্য।

কী ধরনের সাহায্য বল তো ?

আমি লন্ডনে যেতে চাই।

আমাদের রেস্টুরেন্টে ডিসওয়াস করতে ?

আরে না। পড়াশুনো করতে।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। কীভাবে কী করতে হবে তুমি আমাকে সব বলে দেবে।

ঠিক আছে বলব। আমি এখন ওপরে যাচ্ছি। একটু রেস্ট নেব। পরে তোর সঙ্গে কথা হবে।

আচ্ছা।

লুবানা দোতলায় ওঠার সিঁড়ির দিকে চলে গেল।

বিজু তখন আবার ফিরল আগের সেই অনুভূতিতে। মনে মনে বলল, আইরিন, তুমি খুব সুন্দর।

মনজুকে নিয়ে গুলশান পার্কে এসেছে লুবানা।

লেকের ওপরকার ছোট্ট সুন্দর ব্রিজটায় উঠে রেলিংয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল দুজনে।

মনজু মুগ্ধ গলায় বলল, বাহ! জায়গাটা সত্যি চমৎকার।

তোমার ভাল লাগছে ?

খুব ভাল লাগছে। ঢাকা শহরে যে এত সুন্দর জায়গা আছে, আমার জানাই ছিল না।

লন্ডনে এরচেয়েও অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে।

তাতো থাকবেই। অত বড় দেশ, অত ধনী দেশ।

আমরা যেখানটায় থাকি জায়গাটার নাম শুনলে তোমার খুব মজা লাগবে।

কী বল তো ?

নিউবুড়িপার্ক।

কী বুড়িপার্ক ?

নিউবুড়িপার্ক।

মনজু সুন্দর করে হাসল। সত্যি মজার নাম।

তারপর ভেঙে ভেঙে বলল, নিউ বুড়ি পার্ক। নতুন বুড়ি উদ্যান। শুনলেই মনে হয় খুনখুনে সব বুড়িরা পার্কটায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রত্যেকেরই পরনে জোব্বাজাব্বা, প্রত্যেকেরই হাতে লাঠি কিংবা ছড়ি। অনেকেই খুশখুশ করে কাঁশছে।

শুনে খিলখিল করে হেসে উঠল লুবানা।

লুবানার হাসির শব্দ এত সুন্দর, মনজুর মনে হলো জলতরঙ্গের শব্দ হচ্ছে। আর তার প্রাণখোলা হাসির ছটায় যেন একটু বেশি আলোকিত হয়ে গেছে চারদিক।

মনজু মুগ্ধ চোখে লুবানার দিকে তাকিয়ে রইল।

লুবানা বলল, কী দেখছ?

লজ্জা পেয়ে চোখ নামিয়ে নিল মনজু। না কিছু না।

ইস তোমাকে নিয়ে আর পারি না।

কেন কী করলাম আমি?

মনের কথাটা সহজ করে বলতেও পার না।

কী কথা আমার মনে যে বলব?

তুমি কি তখন মুগ্ধ হয়ে আমাকে দেখছিলে না?

কখন?

ওই যে আমি যখন হাসলাম!

হ্যাঁ।

তাহলে বললে না কেন?

কী বলব?

বলতে তোমাকে দেখছি। তোমার হাসি খুব সুন্দর, তোমার হাসির শব্দ খুব সুন্দর। তুমি খুব সুন্দর।

মনজু হাসল। এসব কি আর বলার অপেক্ষা রাখে! তুমি তো সত্যি খুব সুন্দর। তোমার মতো সুন্দর মেয়ে আমি জীবনে দেখি নি। কাল যখন তুমি আমাদের ওই ভাঙাচোরা বাসাটায় এলে, আমাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন বাসাটা কেমন আলোকিত হয়ে গেল। তুমি যতক্ষণ ছিলে আমার শুধু মনে হচ্ছিল দিনেরবেলাও যেন চাঁদের আলো এসে ঢুকেছে আমাদের ওই হতদরিদ্র বাসায়। জ্যোৎস্নায় ভরে গেছে আমাদের ঘর-দুয়ার, আঙিনা। আমার তখন রবীন্দ্রনাথের একটা গানের কথা মনে পড়ছিল।

ও আমার চাঁদের আলো, আজ ফাগুনের সন্ধ্যাকালে
ধরা দিয়েছ যে আমার পাতায় পাতায় ডালে ডালে।

মনজুর কথা শুনে এত মুগ্ধ হলো লুবানা, খানিক কোনও কথা বলতে পারল না। অপলক চোখে তাকিয়ে রইল মনজুর মুখের দিকে। তারপর ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল মনজুর দিকে। তুমি আমার হাতটা ধর। ধরে রাখ।

নরম মায়াবী ভঙ্গিতে লুবানার হাতটা ধরল মনজু।

লুবানা স্বপ্নের মতো ঘোর লাগা গলায় বলল, আমাদের বাড়ির সঙ্গে বিশাল পার্ক। মাইল মাইল সবুজ ঘাসের মাঠ। লোকজন বলতে গেলে একেবারেই নেই। পার্কের গাছপালায় সারাদিন পাখি ডাকে। হাওয়া বয় হুহু করে। হাওয়ায় শুধুই ফুলের গন্ধ।

মনজু মুগ্ধ গলায় বলল, শুনেই কী আশ্চর্য রকমের ভাল লাগছে।

মনজুর চোখের দিকে তাকিয়ে ধীর শান্ত গলায় লুবানা বলল, তোমাকে আমি সেখানে নিয়ে যেতে চাই।

মনজু প্রথমে একটু চমকাল। তারপর সরল মুখ করে হাসল। ধুৎ। তা কী করে সম্ভব?

কেন সম্ভব নয়?

আমার মতো অসহায় দরিদ্র রোগগ্রস্থ যুবক কেমন করে যাবে অমন স্বপ্নের দেশে? দারিদ্র্যের কারণে ঢাকা শহরের সুন্দর জায়গাগুলোই দেখা হয় না, বাংলাদেশে কত কত সুন্দর জায়গা আছে যা কখনই দেখা হয়নি, আর লন্ডনের নিউবুড়িপার্ক! তুমি আমার সঙ্গে মজা করছ?

না একদমই তা করছি না।

তাহলে?

তুমি চাইলেই আমি তোমাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারি।

কীভাবে?

চল কোথাও বসি। বসে কথা বলি।

চল।

ব্রিজ পার হয়ে পার্কের দক্ষিণ পশ্চিম দিকটায় এল ওরা।

এখানে লেকের পাশে সবুজ ঘাসের সুন্দর এক টুকরো মাঠ। মাঠের কোণে একখানা তালগাছ। গাছটির চারপাশে গোলাকার সুন্দর বেদি।

জায়গাটা খুব পছন্দ হলো লুবানার। বলল, চল এখানটায় লেকের দিকে মুখ করে বসি।

চল।

লুবানা আজ পরেছে আকাশি রঙের জর্জেট। শাড়িটায় এমন মানিয়েছে লুবানাকে, মনে হচ্ছে একটুকরো আকাশ যেন নেমে এসেছে ধরণীতে।

/ লুবানার পাশে বসে কথাটা বলল মনজু। কাল তোমাকে মনে হয়েছিল চাঁদের আলো, আজ মনে হচ্ছে আকাশ, এক টুকরো আকাশ।

মানে ?

তোমার শাড়ির রঙ আকাশের মতো। আমার এখন মনে হচ্ছে এক টুকরো আকাশ এই সবুজ মাঠটার তালগাছের তলায় এসে নেমেছে।

এইভাবে বল না।

কেন ?

আমি তাহলে সব কথা তোমাকে এখন বলে ফেলব।

কী কথা ?

আমার মনে যা আছে। অবশ্য তুমি এমন করে না বললেও আমি বলব। না বলে আমার কোনও উপায় নেই।

মনজু আজ পরেছে এ্যসকালারের প্যান্ট আর সাদার কাছাকাছি রঙের একটু মোটা কাপড়ের পানজাবি। সকালবেলা উঠে চার-পাঁচদিন পর আজ সেভ করেছে, গোসল করেছে। ফলে গতকালকার তুলনায় তাকে আজ অনেকটাই ফ্রেস লাগছে।

মনজু বলল, কী এমন কথা যা না বলে তোমার উপায় নেই!

তুমি বোঝনি ?

আমি তোমার মুখ থেকে শুনব।

মনজুর চোখের দিকে তাকিয়ে লুবানা বলল, তুমি কি জানতে সেই কিশোরী বয়স থেকেই তোমাকে আমার ভাল লাগত ?

না।

বল কী ?

সত্যি, আমি কখনও কিছুই বুঝতে পারিনি।

কেন ?

বাবা মারা গেলেন, মাকে নিয়ে অসহায় এক যুবক, টাকা নেই পয়সা নেই, পাশে দাঁড়াবার মতো কোনও মানুষ নেই, তার কি এসব বোঝার সময় থাকে ?

বুঝেছি।

বাবা সামান্য কেরানির চাকরি করতেন। অনেকগুলো দিন অসুখে ভুগলেন। আমাদের যেখানে যা ছিল সব তার চিকিৎসায় গেল। বাবার প্রভিডেন্ট ফান্ডের

বেশির ভাগ টাকাই চিকিৎসার জন্য আগেই তোলা হয়ে গিয়েছিল। আমাদের ঘরে তখন দশটা টাকাও নেই। এই অবস্থায় আমার তো অন্যকিছু ভাববার মতো মনের অবস্থা থাকবার কথা নয়।

লুবানা আবার বলল, আমি সব বুঝেছি। পরিষ্কার কথা হলো সেই কিশোরী বয়স থেকে তোমাকে আমার ভাল লাগত। আমার সেই ভাল লাগাটা আজও আছে।

মনজু লুবানার দিকে তাকিয়ে রইল।

লুবানা বলল, এটা কি তুমি বুঝতে পারছ?

মনজু হাসল। কেন পারব না! আমাদের বাসায় যাওয়ার পর তোমার মুখ দেখেই আমি কিছুটা বুঝেছিলাম।

থ্যাংকস গড যে তুমি বুঝেছ। তবে আসল কথাটা কিন্তু এখনও বলিনি।

বলে ফেল।

বলব তো বটেই। আসল কথাটা বলার জন্যই এরকম এক সুন্দর পরিবেশে আজ তোমাকে আমি নিয়ে এসেছি।

আলতো করে মনজুর ডান হাতটা ধরল লুবানা। আমাদের মাথার ওপর চিরকালীন সুন্দর এক আকাশ। দুপুরবেলার রোদও আজ একদমই চড়া নয়, বেশ মোলায়েম ধরনের রোদ। খুব মায়াবী একটি হাওয়া বইছে। গাছের পাতার আড়ালে বসে ডাকছে পাখিরা। আমাদের মাথার ওপর ছায়া মেলে রেখেছে তালের পাতা। পায়ের তলায় সবুজ সুন্দর ঘাস, পাশে টলটলে জলের সুন্দর লেক, এইসব সাক্ষী, আর সাক্ষী আমার মন। মনজু, আমি তোমাকে ভালবাসি।

শুনে মনজুর বুকটা কেমন করে উঠল। হতবাক হয়ে লুবানার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সে।

লুবানা বলল, আমি তোমাকে খুব ভালবাসি। খুব। বোধবুদ্ধি হওয়ার পর থেকে এমন করে ভাল আমি আর কাউকে বাসিনি।

মনজু তবু কথা বলল না। আগের মতোই তাকিয়ে রইল লুবানার দিকে।

লুবানা বলল, আমি, আমি তোমাকে চাই। সারা জীবনের জন্য আমি তোমাকে চাই।

এবার আপাদমস্তক কেঁপে উঠল মনজুর। দিশেহারা ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল। না না, না। না।

মনজুর আচরণে লুবানাও দিশেহারা হলো। সেও উঠে দাঁড়াল। কেন?

না না। আমরা দুজন দুই ভুবনের মানুষ। দুই ভুবনের।

তাতে কী হয়েছে?

আমি অসুস্থ অসহায় হতদরিদ্র একজন। আর তুমি! না না, এ হয় না। এ কিছুতেই হয় না। আমার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে কেন তুমি তোমার এই সুন্দর জীবন নষ্ট করবে! না না এ হয় না। এ কিছুতেই হয় না।

লুবানা গভীর গলায় বলল, মানুষের জীবন কীভাবে নষ্ট হয় আর কীভাবে সুন্দর, তুমি তা জানো?

এটা আমি জানি। এ হয় না। আমার জন্য নিজেকে তুমি ঠকাতে পার না।

আমি কী পারি না পারি সেটা একান্তই আমার ব্যাপার। নিজেকে আমি ঠকাচ্ছি না জেতাচ্ছি সেটাও আমার ব্যাপার।

না না নিজের জীবন নিয়ে এমন ছেলেমানুষি তুমি করতে পার না।

ছেলেমানুষি নয়। আমি আমার ভালবাসার মূল্য দিতে চাইছি। আমি আমার ভালবাসার মানুষটিকে পেতে চাইছি।

না এ হয় না। এ হয় না।

মনজুর চোখের দিকে তাকিয়ে লুবানা দৃঢ় গলায় বলল, এ নিশ্চয় হবে। আমি দেশে এসেছি তোমার জন্য।

কী?

হ্যাঁ। আমি যা চাই তা পাওয়ার জন্যই চাই। আমি তোমাকে বিয়ে করব।

মনজু কী বলতে চাইল, লুবানা তাকে থামাল। আমার কথা শোন। বিয়ে করে আমি তোমাকে লন্ডনে নিয়ে যাব। আমি ব্রিটিস সিটিজেন। আমার হাজব্যান্ড হিসেবে তুমিও সিটিজেন হয়ে যাবে। তোমাকে এই জীবনের মধ্যে আমি রাখব না। তোমার জীবন আমি একদম বদলে দেব। আমি আর কোনও কিছুই ভাবব না।

মনজু ফ্যালফ্যাল করে লুবানার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

দুলারি উৎফুল্ল গলায় বলল, আমি যে তোমার কথা হোনবার লাগছি হেইডা তুমি জানো ?

বেশ খানিকক্ষণ আগে দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরেছে হাবিব। খানিক আগে রাতের খাবার খেয়েছে। সে আর দুলারি রুটি সবজি, বিজু খেয়েছে ভাত। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে বিজু চলে গেছে তার রুমে। হাবিব এসে ঢুকেছে তাদের বেডরুমে। ঢুকে টেলিভিশন ছেড়ে বিছানায় আধশোয়া হয়েছে।

একটা কাজের বুয়া আছে বাড়িতে। কিন্তু কাজকামে তেমন সুবিধের না। কোনও কাজই দুলারির মনের মতো করতে পারে না। ফলে অবিরাম দুলারি তার সঙ্গে খ্যাচরখ্যাচর করছে। এককাজ দশবার দেখিয়ে দিচ্ছে তবু ঠিক মতো করতে পারছে না।

দুলারি বেশি বাড়াবাড়ি করলে তাকে আবার থ্রেটও করছে। কাম যা করি এইডা লইয়াঐ খুশি থাকেন। বেশি প্যাচাইল পারবেন, কাম ছাইড়া যামুগা। গারমেনসে গিয়া কাম লমু।

এই থ্রেটে দুলারি একটু কাবুও হয়। কারণ আজকাল কাজের লোক বলতে গেলে পাওয়াই যায় না। আদর তোয়াজ করে অকেজো বুয়াগুলোকেই রাখতে হচ্ছে।

তবে বাড়ির সব কাজে দুলারি সারাক্ষণই আছে বুয়াটার সঙ্গে।

রাতের খাবার শেষ করে বিজু এবং হাবিব যে যার রুমে ফিরে যাওয়ার পর বুয়াকে নিয়ে খাবার টেবিলের সবকিছু গোছগাছ করে তবে বেডরুমে এল দুলারি। তারপর ওই কথা বলল।

শুনে হাবিব একটু অবাক হলো। আমার কোন কথা শুনতে শুরু করেছ তুমি ?

ওই যে হেদিন কইলা ছাদে হাঁটবার লেইগা।

ও। হাঁটছ?

হ।

সত্যি?

ছত্য না তয় মিছা নিহি! তুমি দোকান বন্ধ কইরা বাইতে আইলা সোয়া দশটার সমায়। আমি ছাদ থিকা নামলাম দশটায়।

রাতে হাঁটছ?

হ।

কতক্ষণ?

আধাঘণ্টা। ঠিক ছাড়ে নয়টায় গেছি, দশটায় নামছি।

ভাল, খুব ভাল। কিন্তু আমি তো তোমাকে বলেছিলাম বিকেলে হাঁটতে?

বিয়ালে ছাদে গিয়া হাঁটতে আমার ছরম করে।

কিসের শরম?

অন্যবাড়ির ছাদ থিকা মাইনষে আমারে দেখব না?

তাতে কী হয়েছে?

এই রহম মোডা একহান বেডি ছাদের মইদ্যে পাগলের লাহান হাঁটবার লাগছে, দেইখা আমারে লইয়া হাসবো না মাইনষে!

হাবিব হাসল। বুঝেছি। কিন্তু ক'দিন হাঁটবে?

কথাটা বুঝতে পারল না দুলারি। বলল, কী কইলা?

না বললাম কদিন হাঁটবে? হাঁটা বন্ধ করবে কবে?

বিছানায় স্বামীর পায়ের কাছে বসল দুলারি। হাসল। ছিলিম না হওয়া তরি বন্ধ করুম না।

বিশ্বাস করি না।

তুমি দেইখ।

আচ্ছা দেখব।

তারপর একটু থেমে হাবিব বলল, তোমার পাইলসের খবর কী?

ভালা।

সত্যি ভাল?

তয় কি মিছানি।

কিন্তু আমার মনে হয় এই ভাল বেশিদিন থাকবে না।

ক্যালা ?

হোমিওপ্যাথি সাময়িকভাবে ব্যাপারটা হয়তো চাপিয়ে রাখছে, কিন্তু পুরো ভাল হবে না। কিছুদিন পর আবার আগের মতো শুরু হবে।

আরে না।

আমি বললাম তো! তুমি দেখো। তারচে' আমার কথা শোন।

বুজছি তুমি অপরেশনের কথা কইবা!

হ্যাঁ। অপারেশান ছাড়া পাইলস কখনও যায় না। থেকে যাবেই। এবং পাইলস থেকে ক্যান্সার হয়ে যাবে।

হইলে হইব। অপরেশন আমি করামু না। আমার ডর করে।

কিন্তু এই থেকে একদিন বড় বিপদ হতে পারে।

হইলে হইব।

তারপর একটু থেমে দুলারি বলল, আইচ্ছা হোন, পাইলসের অপরেশন কি পুরুষ ডাক্তররা করায় ?

শুনে হেসে ফেলল হাবিব। তুমি চাও পুরুষ ডাক্তাররা করুক!

ধুরো। আমি জানবার চাইলাম ?

তুমি যদি করাও, আমি মহিলা ডাক্তার ম্যানেজ করব।

না আমি করামু না। আর করাইলেও এই দেশে করামু না।

তাহলে কোথায় করাবে ?

কইলকাত্তা গিয়া করামু। ওহেনে বলে এই হগল অপরেশন ভাল হয়।

ওখানে যদি কোনও পুরুষ ডাক্তার অপারেশানটা করে ?

ধুরো। আকথা কইয়ো না। আইচ্ছা হোন, আমি এমুন মোডা হইয়া যাইতাছি ক্যালা জানো ?

কেন বল তো ?

আমার শইল খারাপ যে বন্ধ হইয়া গেছে, এর লেইগা।

এই ব্যাপারটিকে বলে মেনোপজ। একটা বয়সে এটা হবেই। তোমার একটু তাড়াতাড়ি হয়েছে।

হ তাড়াতাড়িঐ তো। আমার আর কী এমুন বয়স হইছে।

কমও হয়নি। চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ তো হবেই। তুমি আমার চে' চার বছরের ছোট। আমার এখন আটচল্লিশ।

তয় তুমি অহনও বহুত ভালা আছে।

কেন আছি জানো? হাঁটাচলা বেশি করি, কাজ বেশি করি, এজন্য।

একটু থেমে দুলারি বলল, হোনও, আরেকহান কথা কইবার চাই তোমারে।

বল।

কিছুদিন ধইরা না আমার আরেকহান বাচ্চার বহুত শখ হয়।

কী?

হ। মনে হয় আরেকহান বাচ্চা হইলে বহুত ভালা হইত।

কিন্তু যখন হওয়ার তখন আমি খুব চেয়েছি, তুমি চাওনি।

হ। আমিঐ চাই নাই। কারণ বিজু হওনের সময় আমি বহুত কষ্ট পাইছি।

হাবিব একটু চুপ করে রইল। তারপর বলল, এরকম তোমার কেন হচ্ছে জানো?

না তো! ক্যালা?

তোমার যে মেনোপজ হয়ে গেছে এজন্য।

ক্যালা, এর লেইগা হইব ক্যালা?

যখন মা হওয়ার ক্ষমতা চলে গেছে তখন মা হতে ইচ্ছে করছে। এটা একটা সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম।

এই নিয়ে দুলারি হয়তো আরও কিছু বলত, তার আগেই দরজার বাইরে লুবানার গলা শোনা গেল। ছোটমামা, আসব?

বিছানায় উঠে বসল হাবিব। আয়।

লুবানা ভেতরে ঢুকল।

হালকা সবুজ রঙের সুতি সালোয়ার-কামিজ পরা লুবানাকে দেখতে খুব ভাল লাগছে।

ঘরে ঢুকেই বলল, তোমার কাছে এরোসল আছে ছোটমামা?

হ্যাঁ আছে।

দাও। আমার রুমে দুইটা তেলাপোকা দেখেছি। ওই জিনিস দেখার পর আমি আর কিছুতেই ঘুমাতে পারছি না।

তুই শিলা-মিলার রুমে থাকছিস না?

হ্যাঁ। কিন্তু তেলাপোকা নিয়ে ওদের কোনও মাথাব্যথা নেই। আমার আছে।

দুলারি বলল, তুমি মশারি টাঙাও না?

হ্যাঁ টাঙাই।

তয় আর ডর কী? তেউলাচোরা তো মশারির ভিতরে যাইবার পারব না।

তবুও আমার ঘুম হবে না।

হাবিব বলল, আচ্ছা এরোসল তুই নিস। তার আগে বোস তোর সঙ্গে একটু গল্প করি। তোকে তো ক'দিন ধরে দেখছিই না। কোথায় যাচ্ছিস, কী করছিস কিছুই বুঝতে পারছি না।

হাবিবের রুমের একপাশে বেতের দুটো চেয়ার আছে। একটা চেয়ারে বসল লুবানা। হাসিমুখে বলল, তেমন কোথাও যাচ্ছি না মামা। একটু ঘুরে টুরে বেড়াচ্ছি।

কোথায়?

এই তো বিভিন্ন জায়গায়।

কিন্তু একা একা ঘুরে বেড়ানো ঠিক হচ্ছে না।

কেন?

এটা লন্ডন না।

বুঝলাম কিন্তু এখানে অসুবিধা কী?

ঢাকার শহরে নানা রকমের ঘটনা ঘটে। সব তোকে আমি বলতে পারব না। তবে সাবধানে চলাফেরা করা ভাল।

লুবানা মিষ্টি করে হাসল। আচ্ছা করব।

আর একটা কথা।

বল।

তুই যে ভাইয়ার ওখানে থাকছিস খাচ্ছিস তোর কোনও অসুবিধা হচ্ছে না তো?

না কিসের অসুবিধা?

মানে কোনও অসুবিধা হচ্ছে কি না!

না একদমই না।

তবুও কাল থেকে তুই আমার এখানে খাবি।

কেন?

এমনিতেই। আমি তোকে একেকদিন একেক রকমের মাছ খাওয়াব। আমাদের ধুপখোলা বাজারে চমৎকার চমৎকার মাছ পাওয়া যায়। আর তুই তো জানিসই তোর মামির রান্না খুব ভাল।

তা আমি জানি। তবে মামি হচ্ছে গরুর মাংস রান্নার স্পেসালিস্ট। মামির হাতের গরুর মাংসের কোনও তুলনা হয় না।

নিজের যে-কোনও কাজের প্রশংসা শুনলে দুলারি একটু বেশি খুশি হয়।

এখনও হলো।

হাসিমুখে বলল, গরুর গোস্ত রাঁন্দনটা আমি আমার মার কাছ থিকা হিগছি। আমি আর কী রাঁন্দি, আমার মার হাতের গরুর গোস্ত খাইলে জিন্দেগিতে ভুলবার পারবা না। আর আমগ বাইতে তো রোজই গরুর গোস্ত রাঁন্দন হয়।

হাবিব বলল, এজন্যই তো সবারই পাইলস আছে। রেগুলার গরুর মাংস খেলে পাইলস না হয়ে উপায় আছে!

হাবিবের কথা বলার ধরনে মজা পেল লুবানা। প্রাণ খুলে হাসল সে।

হাবিব বলল, তোর মা যে কাল ফোন করল, কী বলল?

ওই তো। আমি যেন তাড়াতাড়ি চলে যাই। আমাকে খুব মিস করছে।

এক বাচ্চা হলো এই এক সমস্যা। বিজুও তো লন্ডনে গিয়ে পড়াশুনো করতে চাচ্ছে। কিন্তু ও চলে গেলে যে আমরা কীভাবে থাকব!

কিন্তু বিজুকে নিয়ে কথা বলল না লুবানা। বলল মনজুকে নিয়ে। ছোটমামা, তোমার কি মনজুর কথা মনে আছে?

কোন মনজু?

আমরা লন্ডনে যাওয়ার আগে তোমাদের বাড়িতে ভাড়া থাকত।

হ্যাঁ হ্যাঁ মনে আছে। নিচেরতলার ওইদিককার ফ্ল্যাটে থাকত। ওর বাবা মারা গেল এই বাড়িতে। তোর প্রাইভেট টিউটর ছিল।

হ্যাঁ।

কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ নেই অনেকদিন। কোথায় থাকে তাও জানি না। কেন বল তো?

না এমনি।

আমার চাচাতো ভাই বাবলু, মানে তোর বাবলুমামা, বোধহয় বাবলুর সঙ্গে যোগাযোগ আছে।

লুবানা মনে মনে বলল, বাবলু মামার কাছ থেকেই মনজুর হদিস আমি পেয়েছি।

মুখে বলল, তাই নাকি ?

হ্যাঁ। কেন মনজুকে তোর দরকার ?

না না তা না।

তাহলে ?

হঠাৎ মনে পড়ল তো এজন্য জিজ্ঞেস করলাম।

ও।

তারপর একটু থেমে হাবিব বলল, মনজু ছেলেটা বড় ভাল। মুখটা এত মায়াবী। পড়াশুনোয়ও খুব ভাল ছিল। ইস দিন কীভাবে চলে গেল! মনজুরা যখন ওই ফ্ল্যাটটায় ভাড়া থাকত, ভাড়া ছিল চারশো টাকা। ইলেকট্রিক গ্যাস পানি সবসহ। আর এখন হচ্ছে চারহাজার।

লুবানা কথা বলল না। কী রকম আনমনা হয়ে গেল।

হাবিব বলল, তুই এবার থাকতে চাচ্ছিস কতদিন ?

লুবানা উঠল। দেখি।

তারপর দুলারির দিকে হাত বাড়াল। কই এরোসলটা দাও মামি।

দিতাছি।

বলেই ওয়ার্ডরোবের ওপর থেকে এরোসল নিয়ে লুবানার হাতে দিল দুলারি।

বেরিয়ে যেতে যেতে লুবানা মনে মনে বলল, ছোটমামা, তুমি কি জানো সেই মনজু তোমার ভাগ্নিজামাই হতে যাচ্ছে! তোমার এই ব্রিটিস ভাগ্নিটা যে মনজুকে ভালবাসে তা তুমি জানো!

দুদিন পর মনজুকে নিয়ে আবার গুলশান পার্কে এল লুবানা।

মনজু এখন বেশ সুস্থ। শ্বাসকষ্ট কমে গেছে, জ্বরের ক্লান্তি কেটে গেছে। আজ সে পরেছে ফেডেড জিনসের প্যান্ট আর সাদা টিশার্ট। পায়ে অল্প দামি একটা কেডস। কিন্তু তাতেও খুব মানিয়েছে তাকে।

লুবানা আজও পরেছে জর্জেট। পেস্ট কালারের। যে রঙই পরে তাতেই তাকে এত মানায়! এত ভাল লাগে!

মনজুরও লাগছিল। তবে সেকথা সে বলল না। বলল অন্যকথা। আবার এখানে এলে কেন?

লুবানা হাসল। কথা বলতে।

তাতো বুঝতেই পারছি।

তোমার সঙ্গে আমার আরও অনেক কথা আছে।

সেসব কথা কি বাসায় বলা যেত না?

না যেত না।

কেন?

বাসায় মা আছেন।

তাতে কী? মা কি আমাদের কথা শুনতে আসতেন?

না তা কেন আসবেন!

তাহলে?

আসলে এই জায়গাটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে।

আমারও।

মনে হচ্ছে জীবনের সব কথাই এখানে বসে তোমাকে আমি বলি।

বলার কি আর বাকি আছে?

আছে।

বল তাহলে।

আগে চল বসি।

হ্যাঁ।

সেই তালগাছটির তলায় আবার পাশাপাশি বসল ওরা।

লুবানা বলল, অনেক অনেক কথা এখনও বাকি আছে।

মনজু হাসল। বল।

হ্যাঁ আজ সব বলব।

মনজুর চোখের দিকে তাকাল লুবানা। তার আগে তুমি কি আমার হাতটা একটু ধরবে?

মনজু একটু দিশেহারা হলো। ইস তুমি এমন করে বল!

লুবানা তার ডানহাতটা বাড়িয়ে দিল।

খুবই মায়াবী মোলায়েম ভঙ্গিতে হাতটা ধরল মনজু। লুবানার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

অন্যহাত বাড়িয়ে মনজুর আরেকটা হাত ধরল লুবানা। তারপর মনজুর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, এইভাবে দুজন দুজনার হাত ধরে আমরা কিছুক্ষণ বসে থাকব। তারপর কথাগুলো বলব।

মনজু হাসিমুখে বলল, ঠিক আছে।

কিন্তু এই মুহূর্তে তোমার কাছে আমার একটা জিনিস চাওয়ার আছে।

কী?

রবীন্দ্রনাথের ওই চাঁদের আলোর গানটির দুটো লাইন আমাকে শোনাবে।

কী করে? আমি তো গাইতে পারি না।

গাইতে হবে না। কবিতার মতো করে বল, সেদিন যেমন বলেছিলে।

মনজু সঙ্গে সঙ্গে তার ভরাট সুন্দর গলায় বলল,

'যে গান তোমার সুরের ধারায় বন্যা জাগায় তারায় তারায়
মোর আঙ্গিনায় বাজল গো, বাজল সে সুর আমার প্রাণের তালে তালে'।

লুবানা মুগ্ধ গলায় বলল, বাহ্ কী সুন্দর!

এই গানটিতে আর মাত্র পাঁচটি লাইন আছে।

তুমি আমাকে দু'লাইন দু'লাইন করে শোনাবে।

কিন্তু সব শেষে যে একটা লাইন থেকে যাবে?

ওই লাইনটাও আমি শুনব।

কবে?

জানি না।

তারপর কিছুটা সময় চুপচাপ কাটে। কেউ কোনও কথা বলে না।

চারদিকে দুপুর হয়ে আসা রোদ, গাছের পাতায় হাওয়ার খেলা, পাখির ডাক, এই পরিবেশে তালগাছতলায় বসা মানুষ দুটিকে অসম্ভব পবিত্র দেখায়।

লুবানা বলল, সেদিন আমি শুধু আমার কথা বলেছি। আমার সিদ্ধান্ত তোমাকে জানিয়েছি। তোমার কোনও কথাই আমার শোনা হয়নি। আমি আজ তোমার কথা শুনতে চাই।

কী কথা বল?

আমাকে কি তোমার ভাল লেগেছে?

এটা কী রকম প্রশ্ন হলো?

যে রকমই হোক, তুমি উত্তর দাও।

তোমার মতো মেয়েকে কার না ভাল লাগবে?

এত প্যাঁচিয়ে কথা বলবে না। সরাসরি বল। আমাকে কি তোমার ভাল লেগেছে?

লেগেছে।

কেমন ভাল?

খুব ভাল। খুব।

একথা শুনে আনন্দে একেবারে ফেটে পড়ল লুবানা। খুব খুশি হলাম শুনে। এবার বল, আমাকে কি তুমি আমার মতো করে চাও?

মনজু দুঃখী গলায় বলল, সেই দুঃসাহস কি আমার হওয়া উচিত?

মানে?

আমি সেদিনই বলেছি, কোথায় তুমি আর কোথায় আমি!

আমি এসব শুনতে চাই না।

তাহলে কী শুনতে চাও তুমি ?

তুমি আমাকে সরাসরি বল, আমরা কি বিয়ে করব ? তুমি কি আমার সঙ্গে লন্ডনে যাবে ?

মনজু উদাস হলো। আমার মতো যুবকের জন্য এ এক অলৌকিক স্বপ্ন।

কেন, স্বপ্ন হবে কেন ?

তোমাকে নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি লুবানা। সুন্দর পরিবেশে, সুখে আনন্দে, মনের মানুষকে নিয়ে কার না বাঁচতে ইচ্ছে করে বল ?

তাহলে সমস্যাটা কোথায় ?

আমি আমার মায়ের কথা ভাবছি।

তাঁকে নিয়ে ভাবতে হবে কেন ? মা এখানেই থাকবেন।

মনজু চমকাল। কার কাছে ? কীভাবে থাকবেন ? আমাদের তো কোথাও কেউ নেই।

তাতেই বা অসুবিধা কী ?

তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না।

শোন, মাকে আমরা চমৎকার একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করে দেব। একজন বা দুজন কাজের লোক রেখে দেব। তাঁর খরচের জন্য যা প্রয়োজন তারচে' অনেক বেশি টাকা তাঁকে আমরা পাঠাব। তাহলে আর অসুবিধা কী ?

আছে, সবচে' বড় একটা অসুবিধা আছে।

কী ?

আমি আমার মাকে ছেড়ে একটি মুহূর্তও থাকতে পারি না। আমার মাও পারেন না আমাকে ছেড়ে থাকতে।

শুনে লুবানা বেশ হতাশ হলো। তাহলে ?

মনজু কথা বলল না।

লুবানা বলল, কিন্তু তোমার মাকে তো এখনই লন্ডনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আমার হাজব্যান্ড হিসেবে তোমাকে আমি আমার সঙ্গেই নিয়ে যেতে পারব। তারপর তুমি তোমার মায়ের জন্য এপলাই করলে তিনিও ইমিগ্রান্ট হয়ে যাবেন। কিন্তু সেসব তো অনেকদিনের ব্যাপার। অনেক সময় লাগবে।

তারচে' তুমি তোমার পুরো প্ল্যানটাই বাদ দাও লুবানা।

কেন ?

মাকে নিয়ে আমার জীবন যেভাবে চলছে চলতে দাও।

পরিষ্কার করে বল কী বলতে চাও তুমি।

এ হবে না। ফিরে যাও তুমি। ফিরে যাও।

লুবানা উঠে দাঁড়াল। দৃঢ় গলায় বলল, না।

বিজু বেশ নার্ভাস ভঙ্গিতে ফোনটা করল।

আইরিনই ফোন ধরল। হ্যালো।

আইরিনের গলা শুনে নার্ভাসনেস কেটে গেল বিজুর। কেমন একটা হাঁপ ছাড়ল। বলল, আমি বিজু।

সঙ্গে সঙ্গে গাল ফুলাল আইরিন। এত দেরি করে ফোন করলে কেন?

দেরি মানে?

চারদিন আগে তোমার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। এই চারদিনে একবারও তুমি ফোন করনি।

কে বলেছে করিনি?

করেছ?

হ্যাঁ।

কবে?

পরশু ঠিক এই সময় করেছিলাম।

কে ধরল?

মনে হয় তোমার মা।

ও ওই ফোনটা তাহলে তোমার ছিল! মা ধরার সঙ্গে সঙ্গে কেটে দিয়েছিলে?

হ্যাঁ। কিন্তু তুমি বুঝলে কী করে?

আমি তো সামনেই ছিলাম।

ফোনটা তাহলে ধরনি কেন?

চান্স পাইনি। আমি ধরার আগেই মা ধরে ফেলল। সেদিন অবশ্য আমাদের বাড়িতে অনেক লোকজন ছিল। বড়পা মেজোপা এসেছিল। এই শোন,

মেজোপার বাচ্চা হবে। এটাই প্রথম বাচ্চা। এজন্য বাবা-মার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।

কিন্তু এসব কথা শুনতে ভাল লাগছিল না বিজুর। সেদিনের পর থেকে তার মনের ভেতরটা বেশ এলোমেলো। যখন তখন মনে পড়ে আইরিনের কথা। আইরিনকে খুব দেখতে ইচ্ছে করে, আইরিনের সঙ্গে খুব কথা বলতে ইচ্ছে করে।

কিন্তু আইরিনের পাত্তা নেই। আর ফোন করেনি। বারান্দার রেলিংয়ে এসেও দাঁড়ায়নি। কম্পিউটারের সামনে বসে আড়চোখে বারবার আইরিনদের দোতলার বারান্দার দিকে তাকিয়েছে বিজু। কিন্তু একবারও আইরিনকে দেখতে পায়নি। পরও ফোন করেও পায়নি। এজন্য ভেতরে ভেতরে বেশ একটা ছটফটানি গত দু'তিনদিন ধরে হচ্ছিল বিজুর। কোচিংয়ে গিয়ে পড়াশুনো ভাল লাগছিল না, কম্পিউটার ভাল লাগছিল না। আজ তো কোচিংয়েই যায়নি। ভেবেছে যেমন করে হোক আইরিনের সঙ্গে আজ একটা যোগাযোগ করবেই।

তারপর অপেক্ষা, অপেক্ষা।

আইরিন বলেছে এই সময়টায় ফোন করতে। ভাগ্যিস আজ ফোন করে আইরিনকে পাওয়া গেল।

বিজু বলল, কিন্তু তুমিও তো আমাকে ফোন করতে পারতে?

আইরিন হাসল। হ্যাঁ পারতাম।

করনি কেন?

ইচ্ছে করে।

মানে?

তোমাকে একটু পরীক্ষা করলাম।

কী রকম?

দেখলাম তুমি কর কি না! প্রথমে আমি তোমাকে ফোন করেছি, তারপর তুমি করবে, এটাই নিয়ম।

কিসের নিয়ম?

বুঝে নাও। আমি বলতে পারব না।

ব্যাপারটা বুঝল বিজু। বুঝে আইরিনকে কেমন যেন বড় বড় মনে হলো তার। ক্লাশ নাইনে পড়া মেয়ে, দেখতে শুনতে যেমন বড়, মনের দিক দিয়েও

যেন বেশ বড় হয়েছে সে। এসব ব্যাপার বেশ ভালই বুঝছে। বিজুর চে' অনেক বেশি।

আইরিন বলল, কী হলো? চুপ করে আছ কেন?

কী বলব?

বলার নেই কিছু?

না।

তাহলে একটা গান শোনাও।

আমি গান জানি না। তুমি জানো?

না। তবে আমি অনেক গান শুনি।

কার গান?

সবারই। বেশি শুনি ব্যান্ডের গান।

আমিও শুনি।

কার গান বেশি ভাল লাগে?

কিছুদিন আগ পর্যন্ত সুমনের গান খুব ভাল লাগত।

আমারও সুমনের গান খুব ভাল লাগে। ওই যে ওই গানটা, 'তোমাকে চাই। রাত ভোর হলে আমি তোমাকে চাই।'

এই গানটা আমারও খুব প্রিয়।

কেন? তুমি কি কাউকে চাও?

বিজু হাসল। এই প্রশ্নটা যদি আমি তোমাকে করি?

কর।

তুমি কি কাউকে চাও?

চাই।

কাকে?

একথা তোমাকে আজ বলব না।

তাহলে কবে বলবে?

দেখি কবে বলি। আচ্ছা শোন, তোমাদের বাড়িতে খুব সুন্দর একটা মেয়ে দেখি। সে কে বল তো?

আমার ফুফাতো বোন। লুবানা। লন্ডনে থাকে। কেন, হঠাৎ ওর কথা জানতে চাইলে কেন?

এমনি।

না এমনি নয়। নিশ্চয় কোনও কারণ আছে।

হ্যাঁ কারণ আছে।

কী কারণ বল তো?

তার আগে বল লুবানা তোমার ছোট না বড়?

বড়।

শুনে আইরিন বেশ একটা স্বস্তির ভাব করল। বড় হলে ভাল।

মানে?

মানেটা তোমাকে বলব না।

আমি বুঝেছি।

কী বুঝেছ বল তো?

বলব না।

আইরিন হাসল। তুমি কি জানো যে তুমি খুব মজা করে কথা বল।

না জানি না।

আমি জানি।

আর আমি জানি তুমি খুব সুন্দর করে কথা বল। শোন, আমি কিন্তু লন্ডনে চলে যাব।

শুনে আইরিন বেশ চমকাল। কী?

হ্যাঁ।

কবে?

তা জানি না। লুবানা আপুর সঙ্গে কথা হয়েছে। সে এবার ফিরে গিয়ে কোনও কলেজ কিংবা ইউনিভার্সিটিতে আমার ভর্তির ব্যবস্থা করবে, তারপর আমার ফুফা আমাকে স্পন্সর করবে, আর আমি চলে যাব।

ইস্ যেয়ে দেখো তো!

মানে?

আইরিন ফিসফিসে গলায় বলল, মা এসে পড়েছে। ফোন রাখি। কাল-পরশু যেদিনই চান্স পাই আমি তোমাকে ফোন করব।

ফোন নামিয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে একটু থতমত খেল বিজু।

লুবানা দাঁড়িয়ে আছে।

বিজু হাসিমুখে বলল, লুবানা আপু, তুমি কখন এলে ?

লুবানা উচ্ছল ভঙ্গিতে ভেতরে ঢুকল। এক-দেড় মিনিট হবে।

আমাকে ডাকনি কেন ?

তুই ফোনে ব্যস্ত ছিলি।

তারপর একটু থেমে মজাদার গলায় বলল, কার ফোন ?

আমার এক বন্ধুর।

মেয়েবন্ধু ?

বিজু হাসল। বুঝতে পারছি না তোমাকে সত্য কথা বলব, না মিথ্যে।

আমাকে তুই সত্য কথাই বল। আমি লন্ডনে থাকা মেয়ে। তোর যদি গার্লফ্রেন্ড কিংবা লাভার থাকে শুনতে আমার খারাপ লাগবে না। বরং ভালই লাগবে। তোর মতো হ্যান্ডসাম স্মার্ট একটা ছেলের কেউ থাকবে না এটাই বরং আমি ভাবতে পারছি না। আর তুই যদি আমাকে তোর কথা বলিস আমিও তোকে আমার কথা বলব। অবশ্য তুই না বললেও একটা বিষয়ে তোর সাহায্য আমাকে নিতে হবে।

বিজু হাসল। তাহলে আগে তোমারটা বল। আমারটা পরে বলব।

না তোরটাই আগে বল।

বিজু একটু দ্বিধা করল। তারপর আইরিনের কথা বলল।

শুনে লুবানা খুবই অবাক হলো। ক্লাশ নাইনে পড়া মেয়ে। তাহলে তো একেবারেই পুচকি। ও তো প্রেমের কিছুই বুঝবে না।

তোমার কথাটা ঠিক না।

কেমন্ ?

সে এসব বেশ ভালই বোঝে। যদিও পরিষ্কার করে এখনও আমাকে কিছু বলেনি।

মানে আই লাভ ইউ বলেনি, এই তো ?

হ্যাঁ।

তুই বলেছিস ?

না।

কেন ?

আমি চাই ও আগে বলুক।

আচ্ছা। কিন্তু এই মেয়েকে কি তুই বিয়ে করবি?

ধুৎ। বিয়ে ফিয়ে নিয়ে কে ভাবছে।

তাহলে কি টাইম পাস করার জন্য প্রেম?

আমি এসব কিছুই ভাবছি না। আজ দুদিন হলো ওর সঙ্গে আমি কথা বলছি। আমার ভাল লাগছে কথা বলতে। এই আর কী!

ঠিক আছে, চালিয়ে যা। দেখ কী হয়? তবে কোনও রকমের বাড়াবাড়ি কিন্তু করিস না।

কী রকম?

ইউরোপ আমেরিকাতে টিনএজ ছেলেমেয়েরা প্রেমে পড়ে যেসব করে আর কী!

বিল্লু খুব লজ্জা পেল। ধুৎ।

তারপর একটু থেমে বলল, এবার তোমার কথা বল।

লুবানা একটা সোফায় বসল। বোস।

বিল্লু বসল তার মুখোমুখি।

লুবানা বলল, তোকে একটা কথা দিতে হবে।

বিল্লু হাসল। আমি জানি।

কী বল তো?

আমি যেন তোমার এসব কথা কাউকে না বলি।

রাইট। অবশ্য তোরটাও আমি কাউকে বলব না।

অন্যকাউকে নিয়ে আমার তেমন কোনও ভয় নেই, আমি সবচাইতে ভয় পাই আমার চাচিকে। তার কানে যদি কোনও কথা যায়, তাহলে একেবারে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

শিলা-মিলাও অনেকটা মামির মতোই হয়েছে।

ঠিক বলেছ। ওদের কানেও যদি কোনও কথা যায়, তাহলে এক মুহূর্তে তা যাবে চাচির কানে।

আমি কিন্তু এসব বুঝি। এজন্য যে কথা তোকে আমি এখন বলব, শিলা-মিলার সঙ্গে একরুমে থেকেও, ওরা দুজন মেয়ে, তারপরও কিন্তু ওদেরকে বলার সাহস আমি পাইনি।

খুব ভাল করেছ। ওরা একটু কুটনা টাইপের। আমার চাচাটা এত ভাল আর ওরা যে কেন এমন হলো!

যাকগে যার যেমন ইচ্ছে হোক।

তারপর আস্তে-ধীরে মনজুর কথা সবই বিজুকে খুলে বলল লুবানা।

শুনে বিজু একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল। তুমি তো অদ্ভুত মেয়ে।

কেন?

এত বড়লোকের মেয়ে তুমি! লন্ডনে থাক। মানে ব্রিটিশ সিটিজেন। দেখতে এত সুন্দর, গ্রাজুয়েশান করেছ। সেই তুমি এমন সাধারণ একজনকে ভালবাসলে। তার জন্য এভাবে এবার দেশে এসেছ?

লুবানা মুগ্ধ গলায় বলল, মনজু সাধারণ নয়। অসাধারণ। তাছাড়া আমার প্রথম প্রেম। আমার একমাত্র প্রেম। প্রেম-ভালবাসা বোঝার পর থেকে মনজুকে ছাড়া আর কাউকে আমি ভাবতে পারিনি। লন্ডনে থাকি, কত ছেলে কত রকমভাবে প্রপোজ করেছে আমাকে, তাদের মধ্যে কত অসাধারণ হ্যান্ডসাম স্মার্ট ছেলে, কিন্তু আমার কখনও কাউকে ভাল লাগেনি। আমার চোখ জুড়ে মনজু, মন জুড়ে মনজু। বাবলু মামাকে চিঠি লিখে কেমন কেমন করে ওর এড্রেস আমি জোগাড় করলাম। তারপর দেশে এসে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ওকে দেখার পর নতুন করে আবার যেন ওর প্রেমে পড়লাম, নতুন করে ওকে যেন আবার ভালবাসতে শুরু করলাম।

বিজু তখন কী রকম চোখ করে লুবানার দিকে তাকিয়ে আছে।

ব্যাপারটা খেয়াল করে লুবানা বলল, কী হলো তোর?

ভাবছি।

কী ভাবছিস?

আমার আর আইরিনের কথা। তোমার আর মনজু ভাইর মতো আমার আর আইরিনেরও এটা প্রথম প্রেম। তার মানে আমাদের অবস্থাও হবে তোমাদের মতো?

সত্যিকার প্রেম হলে তো তাই হওয়া উচিত।

তারপর একটু থেমে লুবানা বলল, কিন্তু একটা সমস্যা হয়ে গেছে।

কী সমস্যা?

মনজু তার মাকে ছেড়ে কিছুতেই লন্ডনে যেতে রাজি হচ্ছে না।

বল কী ?

হ্যাঁ।

কিন্তু তার আগে তুমি আমাকে বল ফুফা-ফুফু মনজু ভাইর ব্যাপারে রাজি হবেন তো ?

অবশ্যই হবে। আমার মতের বিরুদ্ধে তারা কখনও যাবে না। বিদেশে থাকা মানুষরা অনেক লিবারেল হয়। আমি আমার মা-বাবাকে নিয়ে ভাবছি না। আমি ভাবছি মনজুকে নিয়ে। এখনই মনজুকে বিয়ে করে তার মাকেসহ আমি তো আর লন্ডনে নিয়ে যেতে পারছি না। ওটা তো সময়ের ব্যাপার। দু'চারবছর লেগে যাবে।

তাহলে কী করবে এখন ?

সেটাই তো বুঝতে পারছি না। তুই একটা কিছু সাজেশান দে।

আমার মাথায়ও কিছু আসছে না।

আমি কি বাবলু মামার সঙ্গে কথা বলব ? সে যদি কোনও সাজেশান দিতে পারে!

আমার মনে হয় বাবলু চাচু খুব একটা ভাল সাজেশান দিতে পারবে না। সে একটু সোজা ধরনের মানুষ।

তাহলে ?

বিজু চিন্তিত গলায় বলল, আমি তোমাকে একজনের কথা বলতে পারি, কিন্তু তোমার কি সাহস হবে তার সঙ্গে কথা বলার ?

কে বল তো ?

বাবা।

ছোটমামা ?

হ্যাঁ। বাবা খুব ইন্টেলিজেন্ট লোক। নিশ্চয় সুন্দর একটা পথ বের করে ফেলবে।

লুবানার মুখটা উজ্জ্বল হলো। ঠিক বলেছিস।

কিন্তু বাবার সঙ্গে এসব আলোচনা করা তোমার ঠিক হবে কি না এটা ভাবতে হবে।

কেন ঠিক হবে না। আমি তো কোনও অন্যায় করছি না। আমি একটা ম্যাচিউরড মেয়ে। তাছাড়া দু'দিন আগে পরে ঘটনাটা সবাই জানবেই।

তাহলে বাবার সঙ্গে কথা বল। সেটাই সবচাইতে ভাল হবে। বাবা দরকার হলে ফুফা-ফুফুর সঙ্গেও কথা বলতে পারবে। মনজু ভাইর মার সঙ্গে কথা বলতে পারবে।

লুবানা উত্তেজিত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল। একদম ঠিক কথা বলেছিস।

বিজুও উঠে দাঁড়াল। তাহলে এক্ষুণি বল।

ছোটমামা কোথায়?

ঘরেই আছে। আর একটা সুবিধা হলো, মা বাড়িতে নেই।

কোথায় গেছে?

তাদের বাড়িতে। এই চান্সে কথাটা তুমি বলে ফেল।

ঠিক আছে।

লুবানা গিয়ে হাবিবের রুমের সামনে দাঁড়াল। ছোটমামা, আসব?

শুয়ে শুয়ে টিভিতে ন্যাশনাল জিউগ্রাফিক চ্যানেল দেখছিল হাবিব। লুবানার গলা শুনে উঠে বসল। আয়।

লুবানা ভেতরে ঢুকল। তুমি কি ব্যস্ত?

না। টিভি দেখছিলাম।

দোকানে যাওনি?

হ্যাঁ। এসময় দোকানটা ঘণ্টা দুয়েক বন্ধ রাখি। বোস।

লুবানা বেতের একটা চেয়ারে বসল।

হাবিব বলল, আজ তুই আমাদের এখানে খেতে আসিসনি কেন?

লুবানা হাসল। মনে ছিল না।

কী?

হ্যাঁ। ওপরে খাবার টেবিলে ভাত দিয়েছে বড় মামি, খেয়ে নিয়েছি।

তাহলে রাতে আমাদের এখানে খাবি।

আচ্ছা।

তারপর ভেতরে ভেতরে মনজুর কথা বলার একটা প্রস্তুতি নিল লুবানা। এইসব মুহূর্তে মানুষ সাধারণত একটু অন্যরকম হয়। লুবানাও হলো।

ব্যাপারটা খেয়াল করল হাবিব। বলল, কী হয়েছে তোর?

লুবানা মাথা নিচু করল। তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই।

বল।

কীভাবে বলব বুঝে উঠতে পারছি না।

কেন?

কথাটা তুমি কীভাবে নেবে সেটা একটা ব্যাপার আর একটা ব্যাপার হচ্ছে তুমি আমাকে কী ভাববে!

হাবিব অবাক হলো। তোর কথার কিছুই আমি বুঝতে পারছি না।

লুবানা এবার হাবিবের চোখের দিকে তাকাল। পরিষ্কার গলায় বলল, ছোটমামা, আমি আমার বিয়ের ব্যাপারে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

লুবানার কথা শুনে হাবিব বেশ একটা ধাক্কা খেল। বিয়ের ব্যাপারে?

হ্যাঁ।

কোথায় বিয়ে? কার সঙ্গে? কয়েকদিন আগেও তো টেলিফোনে আপা দুলাভাইর সঙ্গে কথা হলো, কই তারা তো কিছু বলল না।

তারা জানে না।

এবার আরও চিন্তিত হলো হাবিব। তার মানে কী? তুই আমাকে সব খুলে বল তো!

লুবানা তারপর আস্তে ধীরে মনজুর কথা সব খুলে বলল হাবিবকে।

শুনে হাবিব খানিক স্তম্ভিত হয়ে রইল, তারপর বিছানা থেকে নেমে পায়চারি করতে লাগল। মনজু খুবই ভাল ছেলে। ব্রিলিয়ান্ট। কিন্তু খুবই গরিব। তোর বাবা-মা কি রাজি হবে?

হবে।

সিওর?

হ্যাঁ। আমার পছন্দকেই তারা প্রেফার করবে। গরিব-বড়লোক দেখবে না। আমি আসলে আমার মা-বাবাকে নিয়ে ভাবছি না। আমি ভাবছি মনজুর মাকে নিয়ে। মনজু তার মাকে ছেড়ে কিছুতেই লন্ডনে যেতে চাইছে না। সমস্যাটা এখানেই।

বুঝলাম। কিন্তু তুই কি সব ভেবে ডিসিসানটা নিয়েছিস?

হ্যাঁ মামা। আমি সব ভেবেছি। মনজু ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করার কথা আমি ভাবতে পারি না।

হাবিব চিন্তিত ভঙ্গিতে বিছানায় বসল। তুই তাহলে আমাকে কী করতে বলিস ? আমি কি মনজু বা তার মায়ের সঙ্গে কথা বলব ?

সেটা কি ঠিক হবে ?

তাও তো কথা।

তারপর একটু থেমে বলল, তোর কথায় এইটুকু আমি বুঝেছি যে মনজু তার মাকে প্রচণ্ড ভালবাসে, মাও মনজুকে প্রচণ্ড ভালবাসে।

হ্যাঁ সত্যিই। দুজন দুজনের একেবারে জান।

তুই তাহলে একটা কাজ কর। মনজুর মায়ের সঙ্গে কথা বল।

কী বলব ?

আমাকে যেভাবে সব বললি তাঁকেও এভাবে সব বল। মা নিশ্চয় ছেলের মঙ্গল চাইবেন। আমার ধারণা তিনিই মনজুকে ম্যানেজ করে ফেলবেন। কারণ তোর সঙ্গে বিয়ে হলে যে ছেলেটির জীবন হবে রাজার মতো, ব্রিটিশ সিটিজেন হবে সে, এটা কোনও মা না চেয়ে পারেন না। দেখবি মনজুর মাই সব ঠিক করে ফেলবেন।

শুনে ভীষণ খুশি হলো লুবানা। লাফিয়ে উঠল। ঠিক বলেছ মামা। একদম ঠিক বলেছ। ভেরি গুড সাজেশান। আমি কালই মনজুর মায়ের সঙ্গে কথা বলব।

হাবিব স্নিগ্ধ গলায় বলল, তিঁনি কী বললেন আমাকে জানাবি।

আচ্ছা।

লুবানা উচ্ছল ভঙ্গিতে বেরিয়ে গেল।

শুনে মুখটা উজ্জ্বল হয়ে গেল লুবানার। খুব খুশি হলাম আপনার কথা শুনে। একদম ঠিক বুঝেছেন আপনি। আমি এবার দেশে এসেছি মনজুর জন্যই।

কী ?

হ্যাঁ।

একটু থামল লুবানা। একটু যেন প্রস্তুতি নিল। তারপর চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, একজন বাঙালি মেয়ে হয়ে এসব কথা মুখ ফুটে বলা শোভন নয়, কিন্তু আমার না বলে কোনও উপায় ছিল না।

না না তুমি বল মা, সব আমাকে নিশ্চিন্তে বল।

আমি মনে করি আপনিও আমার একজন মা।

তাতো বটেই।

এবং মায়ের কাছে মেয়ে তার সুবিধা-অসুবিধার কথা বলতেই পারে।

লুবানার কথা শুনে অভিভূত হলেন মা। হ্যাঁ মা, হ্যাঁ। বলতে পারে। অবশ্যই বলতে পারে।

এজন্যই আমি আপনাকে বললাম আমি এবার দেশে এসেছি মনজুর জন্য। বাকিটা আপনি বুঝে নিন।

আমাকে বলে তুমি খুব ভাল করেছ মা। খুব ভাল করেছ। আমার অসহায় ছেলেটির জন্য এরচে' ভাল প্রস্তাব আর হতে পারে না।

মা একটু থামলেন। একটু যেন চিন্তিত হলেন। কিন্তু তোমার মা-বাবা ?

লুবানা সঙ্গে সঙ্গে বলল, তাঁদের অসুবিধা কী ?

না মানে তাঁরা কী ব্যাপারটা জানেন ?

না। এখনও জানেন না।

তাহলে ?

তাঁদের নিয়ে আপনি ভাববেন না।

ভাবতে তো হবেই মা। গার্জিয়ানদের কথা ভাবতে হবে না ? তাঁরা তোমাকে জন্ম দিয়েছেন। কত কষ্ট করে লালন-পালন করে এত বড় করেছেন, তাঁদের কথা ভাববে না মা ?

অবশ্যই ভাবব। তবে আমার মা-বাবা দীর্ঘদিন বিদেশে থাকার ফলে একটু অন্যরকম হয়ে গেছেন।

অন্যরকম মানে ?

মানে মনে-প্রাণে বাঙালিই আছেন। কিন্তু আমার ব্যাপারে বেশ উদার।

কী রকম ?

বিয়ের ব্যাপারে আমার পছন্দটা তাঁরা মেনে নেবেন।

তাহলে তো খুব ভাল কথা।

মা উঠে দাঁড়ালেন। লুবানার পাশে এসে বসলেন। লুবানার একটা হাত ধরলেন। গভীর কৃতজ্ঞতার গলায় বললেন, আমি তোমার কাছে খুব কৃতজ্ঞ মা। খুব কৃতজ্ঞ।

লুবানা একটু বিব্রত হলো। এতে কৃতজ্ঞতার কী হলো ?

তোমার মতো একজন মানুষ পাশে থাকলে আমার ছেলেটি বেঁচে যাবে মা। ভাল থাকবে। সুখে থাকবে।

কিন্তু মনজু তো রাজি হচ্ছে না।

মা চমকালেন। মানে ?

মানে আপনাকে ছেড়ে সে কিছুতেই লন্ডনে যাবে না।

বল কী ?

হ্যাঁ কিছুতেই রাজি হচ্ছে না।

মা স্নিগ্ধ মুখে হাসলেন। হবে, হবে।

সেই ব্যবস্থা আপনাকে করতে হবে। মানে আপনি না বললে কিছুতেই সে রাজি হবে না।

তুমি চিন্তা করো না। আমি ব্যবস্থা করব। ওসব তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও।

মায়ের কথা শুনে খুশিতে একেবারে আত্মহারা হয়ে গেল লুবানা। প্রথমে নতুন বউয়ের মতো মাথায় ঘোমটা দিল সে, তারপর মাকে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করল।

মা বললেন, বেঁচে থাক মা। বেঁচে থাক।

তারপর লুবানার চিবুক তুলে মুগ্ধ চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

সন্ধের পর লুবানাকে তার দোকানের সামনে এসে দাঁড়াতে দেখে খুবই অবাক হলো হাবিব। কি রে, তুই একেবারে দোকানে চলে এসেছিস ?

লুবানা উচ্ছল গলায় বলল, তুমি তো বাড়ি ফিরবে অনেক রাত করে। কিন্তু এমন একটা আনন্দের সংবাদ অতটা দেরি করে তোমাকে আমি দিতে চাইছিলাম না। আমার অস্থির লাগছিল। এজন্য মনজুদের ওখান থেকে বাড়ি না গিয়ে সরাসরি তোমার এখানে এলাম। ভাবলাম খবরটা তোমাকে আগে দিয়ে যাই।

আয় ভেতরে আয়।

লুবানা দোকানের ভেতর ঢুকল।

হাবিবের দোকানটা বেশ বড়সড়। একপাশে ডাক্তারের চেম্বার। কিন্তু ডাক্তার সাহেব কিছুদিন ধরে বসছেন না। কী কাজে সিঙ্গাপুর গেছেন। ফলে সন্ধেবেলা দোকানটায় ভিড় একটু কম। ডাক্তার থাকলে রোগীও থাকত, ওষুদের বিক্রিটাও ভাল হতো হাবিবের।

তবে ডাক্তার নেই বলে যে বিক্রি একেবারেই নেই তেমন নয়। মোটামুটি একটা বিক্রি সবসময়ই দোকানটায় আছে। কারণ হাবিবের দোকানের পজিশানটা বেশ ভাল। নিজের ক্যাপিটালের সঙ্গে লুবানার মায়ের দেয়া দু'লাখ মিলিয়ে দোকানটা বেশ বড় করে ফেলেছে সে।

লুবানা ভেতরে ঢোকার পর হাবিব বলল, চা খাবি ?

খেতে পারি।

এখানকার দোকানের চা কিন্তু তোর খুব মজা লাগবে।

আমি জানি। পুরনো ঢাকার চায়ের দোকানের চা খুব টেস্টি হয়। ঘন করে দুধ দিয়ে, চিনি দিয়ে বেশ টেস্টি একটা জিনিস তৈরি করে।

হাবিব হাসল। তোর মামির ভাষায় 'মালাই ভাসাইকে'।

লুবানাও হাসল। মানে?

মানে হচ্ছে, মালাই বুঝিস তো! দুধের সর। চায়ের মধ্যে দুধের সর ভাসানো আর কী!

বুঝেছি, বুঝেছি।

হাবিবের দোকানের যুবক কর্মচারী রাজু ঘুরে ফিরে লুবানার দিকে তাকাচ্ছিল। হাবিব তাকে বলল, রাজু, সালাউদ্দিনের দোকানে গিয়ে বলে আয় দু'কাপ চা দিতে।

জি আচ্ছা।

রাজু বেরিয়ে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েছে, হাবিব লুবানাকে বলল, ডালপুরি খাবি? সালাউদ্দিনের দোকানের ডালপুরিটা খুব মজার। ডালপুরি আলুপুরি দুটোই পাওয়া যায়। কোনটা খাবি?

ডালপুরিই আনাও। ওরকম ঘন চায়ের সঙ্গে ডালপুরি খেতে খুব মজা লাগবে।

রাজুকে তারপর ডালপুরির কথাও বলল হাবিব।

রাজু বেরিয়ে যাওয়ার পর হাবিব বলল, এবার বল কী হলো?

লুবানা উচ্ছ্বসিত গলায় বলল, তোমার সাজেশানটা দারুণ কাজে লেগেছে মামা। মনজুর মা তো মুগ্ধ।

কী বললেন?

বললেন, তুমি কিছু ভেব না মা। মনজুকে ম্যানেজ করার দায়িত্ব আমার। আর আমার খুব প্রশংসা করলেন।

কী রকম?

মানে তার অসহায় ছেলেটিকে এভাবে দাঁড় করাতে চাইছি আমি, এসব আর কী!

বুঝেছি। এটা অবশ্য সত্যি বিরাট ব্যাপার। আজকালকার দিনে এরকম ঘটনা খুব কম ঘটে।

মানে?

মানে তোর স্ট্যান্ডার্ডের একটা মেয়ে এভাবে একজনের জন্য দেশে ছুটে আসে। তার জন্য এভাবে ভাবে, এটা সত্যি রেয়ার ঘটনা।

লুবানা কথা বলল না।

হাবিব বলল, কিন্তু তোর মা-বাবাকে নিয়ে একটা ভয় আমার আছে।

কিসের ভয় ?

তারা কেউ না বেঁকে বসে ?

না বসবে না। ইংল্যান্ডে দীর্ঘদিন ধরে থাকার ফলে তাদের মন-মানসিকতা এখন অনেকটাই ব্রিটিশদের মতো। কারও ব্যক্তিগত পছন্দের ব্যাপারে তেমন মাথা ঘামাবে না।

কিন্তু তুই একমাত্র মেয়ে।

তাতেও কোনও অসুবিধা নেই।

ধর আজকের পর মনজুর ব্যাপারটা যদি সেটেল হয়ে যায় তাহলে কবে নাগাদ বিয়ে হবে তোদের ?

মাসখানেকের মধ্যেই।

কীভাবে ? তোর মা বাবাকে ছাড়া ?

আরে না।

তাহলে ?

আমি তাদেরকে ফোনে মনজুর কথা জানাব। তাদেরকে দেশে আসতে বলব। তোমাদের বাড়িতেই বিয়ে হবে। তারপর মনজুকে আমার সঙ্গে লন্ডনে নিয়ে যাব।

তুই যত সহজে বলছিস এত সহজে কি সব সম্ভব ?

সম্ভব না কেন ?

তারপর একটু থেমে বলল, তোমার কী মনে হয় ? সম্ভব না ?

পুরো ব্যাপারটাই তোর মা-বাবার ওপর নির্ভর করে।

না মামা, তা করে না।

তাহলে কার ওপর নির্ভর করে ?

মনজুর ওপর।

তাই ?

তাই। কারণ আমি আমার মা-বাবার ব্যাপারটা জানি বলেই এতটা জোর দিয়ে আবারও বলছি, আমার মা-বাবা আমার মতের বিরুদ্ধে কিছুতেই যাবে না। আর যদি যায় তাহলে ভুল করবে।

কী রকম ?

আমি তাদের কথা শুনব না।

হাবিব অবাক হলো। কী বলছিস তুই ?

লুবানা কঠিন গলায় বলল, ঠিকই বলছি। কারণ আজ পর্যন্ত কখনও কোনও কাজে আমি আমার মা-বাবার বিরুদ্ধে যাইনি। তারা যা বলেছে শুনেছি। তাদের অমতে কিছু করিনি। এই একটা ব্যাপারে আমার বিরুদ্ধে যাওয়া তাদের ঠিক হবে না। কারণ এটা আমার সারা জীবনের ব্যাপার। আমি যাকে নিয়ে সুখে-আনন্দে আমার জীবনটা আমার মতো করে কাটাব বা কাটাতে চাই সেক্ষেত্রে তারা কেন বাধা হয়ে দাঁড়াবে ?

লুবানার দৃঢ়তা দেখে হাবিব কী রকম একটু হতভম্ব হলো।

এসময় রাজু এসে ঢুকল দোকানে। তার পেছনে সালাউদ্দিনের চায়ের দোকানের একটি কিশোর ছেলে। হাতে টিনের একটা থালায় দু'কাপ চা-পিরিচ দিয়ে ঢাকা, আর একটা কাগজের ঠোঙায় ছ'টা ডালপুরি।

ছেলেটাকে রাজু বলল, ওই পিচ্চি, চায়ের কাপ দুটো কাউন্টারে নামিয়ে রাখ।

তারপর ঠোঙাটা নিয়ে হাবিবের হাতে দিল। এই যে ডালপুরি।

ঠোঙার মুখ খুলে লুবানার দিকে এগিয়ে দিল হাবিব। নে।

লুবানা একটা ডালপুরি নিল।

তারপর চায়ের কাপ এগিয়ে দিল হাবিব। চায়ের সঙ্গে খা। বেশি মজা লাগবে।

এক কামড় ডালপুরি আর এক চুমুক চা, এইভাবে খেতে লাগল লুবানা।

বাড়ি এসে বিজুকেও একই ভঙ্গিতে খবরটা দিল লুবানা।

শুনে বিজু খুব খুশি। বলেছিলাম না বাবাকে ধর। কাজ হবে। বাবা খুব ইন্টেলিজেন্ট লোক।

ঠিকই বলেছিস।

বিজু ছিল তার কম্পিউটারের সামনে। লুবানাকে দেখে চেয়ার ঘুরিয়ে তার দিকে মুখ করেছে।

লুবানা ততক্ষণে বিজুর বিছানায় বসেছে।

বিজু বলল, তাহলে তোমাদের বিয়ে কবে ?

দেখা যাক। মনজুর সঙ্গে আবার কথা হোক তারপর বলতে পারব।

তার মানে তুমি সাকসেস।

আশা করছি। তোর খবর কী ?

আমার কোন খবর ?

ওই যে তোর বালিকা, আইরিন।

সে তো ভালই আছে!

আজ কথা হয়েছে ?

হ্যাঁ। আজ ওর সঙ্গে শুধু তোমার কথাই বললাম।

হঠাৎ ?

লন্ডন যাওয়ার প্রসঙ্গে তোমার কথা হলো। আমার লন্ডন যাওয়ার ইচ্ছেটাই সে পছন্দ করছে না।

কেন ?

তা পরিষ্কার করে বলছেও না।

তুই বুঝতে পারছিস না কেন সে চাইছে না তুই বিদেশে যাস ?

খানিকটা বুঝতে পেরেছি। ভাবছে বাইরে গেলে আমি ওকে ভুলে যাব।

হ্যাঁ তাই।

তখনই তো তোমার কথা ওকে আমি বললাম। বললাম মনজু ভাইকে ছোটবেলা থেকেই পছন্দ করে লুবানা আপু। কিন্তু সেই বয়সে মনজু ভাইকে সে তা জানতে দেয়নি, মনজু ভাইও তাকে কিছু জানতে দেয়নি। তারপর দুজন সরে গেছে দুদিকে। একজন বাংলাদেশে আরেকজন লন্ডনে। বহুকাল কারও সঙ্গে কারও যোগাযোগ নেই। তারপর লুবানা আপু এসে মনজু ভাইকে খুঁজে বের করেছে এবং এতদূর এগিয়েছে।

শুনে কী বলল ?

বলল লুবানা আপুর জায়গায় আমি হলেও এমনই করতাম।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। কিন্তু তারপর অন্য আর একটা কথাও বলেছে।

কী ?

বলেছে ছেলে আর মেয়েতে নাকি অনেক ব্যবধান। প্রেমের ব্যাপারে মেয়েরা খুবই সিরিয়াস হয়। ছেলেরা অতটা হয় না। যদি ব্যাপারটা উল্টো হতো, লুবানা আপুর জায়গায় যদি হতো মনজু ভাই তাহলে নাকি এমন হতো না।

যাহ।

ও তো তাই বলল।

তার মানে আইরিন সিওর তুই লন্ডনে চলে গেলে আমি যেভাবে মনজুর জন্য ছুটে এসেছি তুই সেভাবে ওর জন্য কখনও ছুটে আসবি না।

তাই তো বোঝাল।

ওকে তুই বলবি এটা ঠিক না। সত্যিকার ভালবাসা থাকলে সবই সম্ভব। পৃথিবীতে এমন অনেক ঘটনা আছে, প্রেমের জন্য রাজ্য ছেড়ে দিয়েছেন রাজা। দরিদ্র মেয়ের প্রেমে পড়েছেন রাজকুমার। রাজা-রাণী তা মেনে নেয়নি। সেই মেয়ের জন্য রাজ্যের লোভ, সিংহাসনের লোভ ছেড়ে সেই মেয়ের হাত ধরে পথে নেমে গেছেন রাজকুমার। আবার এর উল্টোটাও হয়েছে। রাখালের প্রেমে পড়ে সেই রাখালের সঙ্গে চলে গেছে রাজকন্যা। কুঁড়েঘরে সংসার পেতেছে। সত্যিকার ভালবাসায় নারী-পুরুষ দুজনেই সমান। কেউ কারও চেয়ে কম কিংবা বেশি নয়।

লুবানার কথা শুনে মুগ্ধ হলো বিজু। ইস তুমি যা সুন্দর করে কথা বল না লুবানা আপু! সুন্দর করে কথা বলা মানুষ আমার খুব ভাল লাগে। সুন্দর করে কথা বলা একটা আর্ট।

লুবানা উঠে দাঁড়াল। মানুষ কখন সুন্দর করে কথা বলে জানিস?

কখন?

গভীর প্রেমে ডুবে থাকলে। আসলে প্রেম এমন এক শক্তি যে শক্তি মানুষের সবকিছু বদলে দেয়। মানুষকে সুন্দর করে। সাধারণ মানুষকে অসাধারণ করে ফেলে।

বিজুর রুম থেকে বেরিয়ে গেল লুবানা।

মনজু আজ বাড়ি ফিরল রাত সাড়ে দশটার দিকে।

বিকেল থেকে একটানা টিউশনি। বাড়ি ফেরার পর শরীর আর চলতে চায় না। এত ক্লান্ত এবং অবসাদ লাগে।

আজও লাগছিল।

এজন্য নিজের রুমে ঢুকে জামা-কাপড়ও ছাড়ল না, সোজা বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

মনজুর পেছন পেছন মাও এলেন। মনজুকে শুয়ে পড়তে দেখে উদ্বিগ্ন হলেন। পাশে বসে মনজুর মাথায় হাত দিলেন। শরীর খারাপ লাগছে, বাবা?

মনজু ম্লান হাসল। ক্লান্ত গলায় বলল, না মা।

তাহলে বাড়ি ফিরেই যে শুয়ে পড়লি?

টায়ার্ড লাগছে।

এ রকম ঘুরে ঘুরে ছাত্র পড়ানো, টায়ার্ড তো লাগবেই।

তার ওপর এক ছাত্রের বাড়িতে আবার রাতের খাবারটাও খেয়ে আসতে হলো।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

তারপর একটু থেমে বলল, কিন্তু খেতে আমার ভাল লাগেনি।

কেন বাবা?

তুমি জানো না?

বুঝেছি। আমাকে ছাড়া খেতে তোর ভাল লাগেনি।

হ্যাঁ।

কিন্তু এটা তো ঠিক না বাবা।

কেন?

সারাজীবন আমার জন্য এমন করবি কেন তুই?

তাহলে কার জন্য করব? তুমি ছাড়া আমার আছে কে?

এখন হয়তো নেই। কিন্তু হবে।

কে হবে?

মা একটু চুপ করে রইলেন। তারপর ছেলের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, আমি চাই এই জীবনটা তোর বদলে যাক।

মনজু কেমন একটু চমকাল। তারপর বলল, তাতো আমিও চাই। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও তো তোমাকে নিয়ে চলার মতো একটা চাকরি পাচ্ছি না।

চাকরির দরকার নেই।

মানে?

চাকরির চেয়েও অনেক বড় কিছু তুই পেয়ে যাবি।

মুখ ঘুরিয়ে মায়ের মুখের দিকে তাকাল মনজু। তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না মা।

মা হাসিমুখে বললেন, লুবানা এসেছিল।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

কী বলল?

অনেক কথা।

কী কথা আমাকে বল।

সবকথা। তোকে নিয়ে সবকথা।

মনজু খুবই উত্তেজিত হলো। বিছানায় উঠে বসল। সবকথা মানে? কী কথা?

তুই জানিস, কী কথা!

তবু তুমি বল।

লুবানাকে আমার খুব পছন্দ।

বুঝলাম। আর?

আমি চাই সে আমার বউ হোক।

মনজু থতমত খেল। কিন্তু...

কোনও কিন্তু নেই। লুবানা যা চাইছে তাই হবে।

মনজু ফ্যালফ্যাল করে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

মা বললেন, ওর সঙ্গে কথা বলে বুঝেছি, ওর মতো করে কেউ তোকে আগলে রাখবে না। কেউ তোর পাশে দাঁড়াবে না।

মনজু কাতর গলায় বলল, কিন্তু তোমাকে ছেড়ে আমি কেমন করে থাকব মা?

থাকতে হবে বাবা। জীবন এরকমই।

তুমিই বা আমাকে ছেড়ে কেমন করে থাকবে?

আমি পারব।

মনজু অবাক হলো। তুমি পারবে? কেমন করে পারবে মা? কেমন করে পারবে? আমি না থাকলে তোমার আর থাকবে কে?

কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেলল মনজু।

দু'হাতে মনজুর মাথাটা বুকে টেনে আনলেন মা। ছেলের মাথায়-পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, আমার জীবনের একটাই চাওয়া বাবা, যেখানেই থাকিস তুই, সুখে থাক, সুস্থ থাক। আমাকে নিয়ে তুই ভাবিস না। আমার দিন কোনও না কোনওভাবে কেটে যাবে।

কথা বলতে বলতে কখন যে কাঁদতে শুরু করেছেন মা, তিনি তা টের পাননি। এখন চোখের জলে গাল ভাসছে তাঁর। আর তাঁর বুকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল মজনু।

দরজা খুলে বিজু বলল, কাকে চাই ?

মনজু স্নিগ্ধ গলায় বলল, তার আগে তুমি আমাকে বল, তুমি কে ?

আমি বিজু।

আমি ওরকমই ধারণা করেছিলাম। তোমাকে আমি বেশ ছোট দেখেছি।

কিন্তু আপনাকে আমি ঠিক চিনতে পারছি না।

আমি মনজু। এক সময় তোমাদের বাড়িতে আমরা ভাড়া থাকতাম।

মনজুর নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে উৎফুল্ল হলো বিজু। আপনি মনজু ভাই ? আমি আপনাকে চিনেছি। আসুন-আসুন, ভেতরে আসুন।

মনজু ভেতরে ঢুকল।

বিজু বলল, লুবানা আপু আপনার কথা আমাকে বলেছেন।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ।

তারপর হাসল বিজু। আমি আপনাদের সবকথাই প্রায় জানি।

ও আচ্ছা।

আপনি বসুন। আমি লুবানা আপুকে ডাকছি।

একটু দাঁড়াও।

বিজু দাঁড়াল।

হাবিব মামা কি বাড়িতে আছেন ?

জি আছেন। তবে এক্ষুণি বেরিয়ে যাবেন। মানে দোকানে যাবেন।

আমি একটু মামার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

সিওর।

আগে মামার সঙ্গে কথা বলি তারপর লুবানাকে তুমি ডেকো।

জি আচ্ছা।

খানিক পর হাবিব এসে ঢুকল এই রুমে।

মনজু একটা সোফায় বসেছিল। হাবিবকে দেখে উঠে দাঁড়াল। স্লামালেকুম।

ওয়ালাইকুমসালাম। বস বস।

মনজু বসল। হাবিব বসল তার মুখোমুখি। কেমন আছ? অনেকদিন পর তোমাকে দেখলাম।

মনজু বিনীত গলায় বলল, জি। অনেকদিন পর এদিকটায় এলাম।

ভাল আছ তো?

জি।

তোমার মা ভাল আছেন?

জি আছেন।

বল তারপর কী খবর? কী মনে করে এলে?

মনজু মাথা নিচু করে বলল, আপনি বোধহয় কিছুটা বুঝতে পারছেন?

হ্যাঁ। লুবানা আমাকে বলেছে।

আমার অসুবিধার কথাটাও নিশ্চয় বলেছে?

তোমার মায়ের কথা তো?

জি।

বলেছে। তবে তুমি তোমার মাকে নিয়ে যেভাবে ভাবছ তোমার মা বোধহয় ঠিক সেভাবে ভাবছেন না।

মানে?

মানে লুবানা তোমার মায়ের সঙ্গে কথা বলেছেন। তিনি চাইছেন লুবানা যেভাবে চাইছে সেভাবেই সব হোক।

কিন্তু আমার মা কী করে আমাকে ছেড়ে থাকবেন?

হাবিব হাসল। তিনি পারবেন। তুমি পারবে কি না তাই বল?

মনজু মন খারাপ করা গলায় বলল, আমি পারব না। আমি সত্যি আমার মাকে ছেড়ে থাকতে পারব না।

তাহলে ?

এসব বিষয়ে আলোচনা করার জন্যই এলাম। আপনি আমাকে কিছু একটা সাজেশান দিন।

হাবিব হাসল। লুবানাকেও সাজেশান দিচ্ছি, তোমাকেও দিচ্ছি। আমি তো পড়ে গেলাম একেবারে মাঝখানে।

ভাল মানুষদের এই অবস্থাই হয়।

হাবিব একটু চুপ করে রইল। তারপর বলল, লুবানার ভাবনাটা খুব ভাল। বিশেষ করে তোমার মতো ছেলের জন্য খুবই ভাল।

জি তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

তুমি একটা কাজ করতে পার। আমি যদি তোমার মায়ের দায়িত্ব নিই ?

কী রকম ?

গেণ্ডারিয়াতে আমাদের বাড়ির কাছে তাঁকে একটা বাসা ভাড়া করে দিলাম। আমরা সবাই মিলে তাঁর দেখাশোনা করলাম। দু'চারটা বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে। তারপর তাঁর কাগজপত্র হয়ে গেলে তাঁকেও তো তোমাদের কাছে নিয়ে যেতে পারছ।

মনজু ম্লান গলায় বলল, এটা খুবই ভাল প্রস্তাব। কিন্তু আমি যে মাকে ছেড়ে থাকতে পারি না!

তাহলে তো আমার আর কিছু বলার থাকল না।

হাবিব উঠল। তুমি তাহলে লুবানার সঙ্গে কথা বলে দেখ কী করা যায়। আমি দোকানে যাই। দোকান খুলতে হবে।

মনজু বিনীত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল। জি আচ্ছা।

হাবিব বেরিয়ে যাওয়ার পর পাগলের মতো ছুটে এল লুবানা। তুমি ?

মনজু হাসল। কেন আসতে পারি না ?

অবশ্যই পার।

তাহলে ?

লুবানা মিষ্টি করে হাসল। আমার খুব ভাল লাগছে।

কিন্তু আমার একটু খারাপ লাগছে।

কেন ?

অনেকদিন পর গেণ্ডারিয়াতে এলাম। এই বাড়িতে এলাম।

এজন্য ?

না মানে এই বাড়িতে বাবা মারা গিয়েছিলেন তো ?

আমি বুঝেছি।

তারপর একটু থেমে বলল, কী খাবে ?

কিছু না।

কেন ?

এমনি। ইচ্ছে করছে না।

চা খাও। চা দিতে বলি।

না থাক।

কেন ?

খেলে পরে খাওয়া যাবে। তুমি বস। তোমার সঙ্গে কথা বলি।

মনজুর মুখোমুখি বসল লুবানা।

আজ সে পরে আছে জিনস আর ফুলস্লিভ ঢোলা ধরনের সাদা শার্ট। ফলে দেখতে খুব অন্যরকম লাগছে তাকে।

কথাটা মনজু বলল। তোমাকে আজ খুব অন্যরকম লাগছে।

লুবানা হাসল। ভাল না খারাপ ?

ভাল তবে অন্যরকম ভাল। বাঙালি মেয়ে মনেই হচ্ছে না।

ব্রিটিশ মনে হচ্ছে ?

হ্যাঁ।

আমি তো ব্রিটিশই। ব্রিটেনের সিটিজেন।

তাতো জানিই।

মনজুর চোখের দিকে তাকাল লুবানা। হাসিমুখে বলল, এবার আসল কথা বল।

মনজুও তাকাল লুবানার দিকে। মা আমাকে সব বলেছেন।

সেজন্যই কি আমার সঙ্গে কথা বলতে এলে ?

হ্যাঁ।

বল।

লুবানা, সব মা-ই চান তাঁর সন্তান সুখে থাক। ভাল থাক। তাই না ?

তাই।

আমার মাও চাইছেন।

তা আমি মায়ের সঙ্গে কথা বলে বুঝেছি।

এবং তোমার জন্য একটা সুসংবাদ আছে।

কী?

মা তোমাকে খুব পছন্দ করেছেন।

লুবানা হাসল। তাও আমি জানি। কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন আছে।

কী?

তুমি? মানে তুমি আমাকে পছন্দ করনি?

মনজু উদাস গলায় বলল, করেছি কি না তা তুমি জানো। জানো না?

জানি।

তারপরই এগিয়ে এসে মজনুর একেবারে গা ঘেঁসে বসল লুবানা। দু'হাতে মনজুর একটা হাত ধরল। আমি জানি তুমি আমাকে পছন্দ কর। তবু মুখে একটু বল না, প্লিজ।

কী বলব?

বল আমাকে তুমি খুব পছন্দ কর।

সত্যি আমি তোমাকে খুব পছন্দ করি।

বল আমাকে তুমি খুব ভালবাস।

আমি তোমাকে খুব ভালবাসি। খুব। আমার মা-বাবা ছাড়া এত ভাল আমি আর কাউকে বাসিনি।

সত্যি?

সত্যি। আমার সৌভাগ্য, গভীরভাবে ভালবেসে তোমার মতো একজন মানুষ আমার পাশে দাঁড়াতে চাইছে। আমার এই হতদরিদ্র অসুস্থ এবং দুঃখের জীবন বদলে দিতে চাইছে।

মনজুর হাতটা টেনে নিয়ে শিশুর ভঙ্গিতে গালের কাছে ধরে রাখল লুবানা। গভীর আবেগের গলায় বলল, ইস আমার যে কী ভাল লাগছে! আমি তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না।

আমি বুঝতে পারছি। তোমার আবেগ দেখে আমি সব বুঝতে পারছি।

দেখবে আমরা দুজন খুব সুখী হব, খুব সুখী।

মনজু দুঃখী গলায় বলল, কিন্তু মাকে ছেড়ে থাকতে হলে সুখী আমি কিছুতেই হতে পারব না।

একথা শুনে লুবানা কী রকম নিভে গেল। তাহলে ?

মনজু এবার খুবই মায়াবী ভঙ্গিতে লুবানার কাঁধে হাত রাখল। আমি তোমাকে একটা কথা বলব ?

বল।

তুমি কি তোমার প্ল্যানটা বদলাতে পার না ?

কী রকম ?

তুমি এদেশেই থেকে গেলে।

মানে ?

মানে আমার সঙ্গে এদেশেই আমার গরিব সংসারে তুমি থেকে গেলে। তুমি আমি, আমার মা— আমরা তিনজন মানুষ একসঙ্গে থাকলাম।

লুবানা অপলক চোখে মনজুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

মনজু বলল, সংসারে হয়তো প্রাচুর্য আমাদের থাকবে না, দরিদ্র সংসারে অভ্যস্থ হতে তোমার সময় লাগবে। তবু সুখে তো আমরা থাকতে পারব!

লুবানা তবু কোনও কথা বলল না। আগের মতোই তাকিয়ে রইল মনজুর দিকে।

লুবানার একটা গাল ছুঁয়ে মনজু বলল, আমার এই কথাটা তুমি রাখ। আমার মায়ের কাছ থেকে আমাকে তুমি দূরে সরিয়ে নিও না।

লুবানা তবুও কথা বলল না। মনজুর দিকে তাকিয়েই রইল।

বিজু চিন্তিত গলায় বলল, তুমি তো বেশ ভাল ঝামেলায় পড়েছ।

লুবানা হতাশ গলায় বলল, তাই তো দেখছি।

কী করবে এখন ?

বুঝতে পারছি না।

বাবার সঙ্গে কি আবার একটু কথা বলবে ?

বলতে পারি। কিন্তু তার আগে তো আমাকে একটা ডিসিসান নিতে হবে।

কী ডিসিসান ?

বিয়ের। মানে মনজু আর আমি চুপচাপ বিয়েটা করে ফেলি।

তারপর ?

তারপর আমি আর লন্ডনে ফিরে গেলাম না।

একথা শুনে চমকে উঠল বিজু। বল কী ?

হ্যাঁ এছাড়া তো আর কোনও উপায় দেখছি না।

প্রেমের জন্য এত স্যাক্রিফাইস করবে ?

করা উচিত না ?

বিজু মুগ্ধ গলায় বলল, তুমি আসলে গ্রেট লুবানা আপু। সিম্পলি গ্রেট।

তাহলে একটু মামার দোকানে যাই।

কেন ?

মামার সঙ্গে কথা বলে আসি।

বাবা তো বাড়িতে।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ।

মামা এসময় বাড়িতে কেন ?

বোধহয় শরীর ভাল না।

তাহলে দোকানে কে ?

দোকান বন্ধ।

ঠিক আছে। আমি তাহলে মামার সঙ্গে কথা বলি।

লুবানা গিয়ে হাবিবের রুমে ঢুকল।

হাবিব একটা চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে আছে।

লুবানা বলল, তোমার নাকি শরীর খারাপ ?

হ্যাঁ রে মা।

কী হলো ?

জ্বর জ্বর লাগছে।

মামি কই ?

ছাদে।

রাতেরবেলা ছাদে কী করে ?

ব্যায়াম।

মানে ?

স্লিম হওয়ার জন্য হাঁটছে।

ভালই হলো।

মানে ?

তোমাকে একা পেলাম। কথা বলতে সুবিধা হবে।

কী কথা ?

ওই একই কথা।

লুবানা বলল। আমরা বিয়ে করে ফেলতে চাই।

হাবিব থতমত খেল। মানে ?

মানে নিজেদের মতো চুপচাপ বিয়ে করে ফেলব।

তারপর ?

তারপর আর কী ? তুমি শুধু আমার একটা কাজ করে দাও।

কী ?

লন্ডনে ফোন করে মা-বাবা দুজনার সঙ্গেই কথা বল।

কী বলব ?

মনজুর কথা সব বলবে। তার মায়ের কথা বলবে। এবং বিয়ে করে আমি যে এদেশে থেকে যাচ্ছি সে কথাও বলবে।

হাবিব আবার চমকাল। এদেশে থেকে যাচ্ছিস মানে ?

হ্যাঁ আমি আর লন্ডনে যাব না। মনজুর সঙ্গে মনজুর সংসারেই থাকব। তাহলে সব সমস্যাই মিটে যায়।

হাবিব গম্ভীর ভঙ্গিতে উঠে বসল। দৃঢ় গলায় বলল, না।

লুবানা থতমত খেল। মানে ?

মানে এটা হতে পারে না।

কী বলছ মামা ?

ঠিকই বলছি। এ পর্যন্ত মনজুর ব্যাপারে তোকে আমি সাপোর্ট করেছি এই কারণে যে ছেলেটি ব্রাইট। বিয়ে তার সঙ্গে তোর হতে পারে একটাই শর্তে সে তোর সঙ্গে লন্ডনে গিয়ে থাকবে।

কিন্তু একজন বাঙালি মেয়ে হিসেবে আমারই তো উচিত স্বামীর সংসারে থেকে যাওয়া। স্বামীর অবস্থানটি মেনে নেয়া!

আমি তা স্বীকার করি। কিন্তু কোনও বাবা-মা কোনও পরিস্থিতিতেই এটা মেনে নিতে চাইবে না।

তার মানে তুমি বাবা-মার সঙ্গে কথা বলবে না ?

বলতে আমি চাচ্ছি না। তুই বললে আমি না হয় মনজুর সঙ্গে আবার কথা বলি। ওকে আবারও বোঝাবার চেষ্টা করি।

লুবানা চিন্তিত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল। থাক তার আর দরকার নেই। আমার সিদ্ধান্ত আমিই নেব। আমিই মা-বাবার সঙ্গে কথা বলব।

লুবানা আর দাঁড়াল না।

নিজের রুমের দরজার সামনে লুবানাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখবেন এটা কল্পনাও করেননি মা। তিনি বেশ হকচকিয়ে গেলেন। প্রায় ছুটে এলেন দরজার কাছে। কী গো মা, তুমি? তুমি কখন এলে?

এই তো এইমাত্র।

এসো, এসো।

লুবানা মায়ের রুমে ঢুকল।

আজ সে আবার শাড়ি পরেছে। ধপধপে সাদা জর্জেট। আজ তাকে একেবারেই বাঙালি মেয়ে মনে হচ্ছে।

মায়ের রুমে ঢুকে বিছানায় বসল লুবানা। আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।

বল মা।

মাও বসলেন লুবানার পাশে।

লুবানা বলল, কথা মানে আমি আজ আর একটা সিদ্ধান্তের জন্য আপনার কাছে এসেছি।

ওসব কথা পরে হবে। আগে তোমাকে চা দিই।

আমি এখন চা খাব না।

কেন মা?

এমনিতেই। ইচ্ছে করছে না। আপনি বসুন, আগে আপনার সঙ্গে কথা শেষ করি। তারপর মনজুকে বলব।

আচ্ছা।

মনজু বাসায় তো?

হ্যাঁ।

কী করছে ?

টেবিলে বসে কী সব লেখালেখি করছে। আজকালকার ছাত্র পড়ানোও কঠিন কাজ মা।

কী রকম ?

টিচারদের পড়াশোনা করতে হয় ছাত্রদের চে' বেশি।

একটু থামলেন মা। তারপর বললেন, বল মা, বল। কী সিদ্ধান্ত নিতে চাইছ ?

মনজুর সঙ্গে সেদিন কী কথা হয়েছে সব খুলে বলল লুবানা।

শুনে মা একেবারে স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

লুবানা বলল, কিন্তু আমি জানি মনজুর প্রস্তাবে আমার মা-বাবা কিছুতেই রাজি হবেন না। আমি তাঁদের একমাত্র মেয়ে। আমি আমার পছন্দ মতো বিয়ে করে আমার বরকে লন্ডনে নিয়ে গেলে সেটা তাঁরা মেনে নেবেন কিন্তু বিয়ে করে বাংলাদেশে থেকে যাওয়াটা তাঁরা কিছুতেই মেনে নেবেন না।

মা শূন্য গলায় বললেন, তাহলে ?

আমি ডিসিসান নিয়েছি আমরা বিয়ে করে ফেলব।

মা চমকে উঠলেন। মানে ?

মানে মা-বাবা, আত্মীয়স্বজন কাউকে কিছু না জানিয়ে আগে বিয়ে করে ফেলব। পরে সবাইকে জানাব। তখন আর কারও মেনে না নিয়ে উপায় থাকবে না।

মা ফ্যালফ্যাল করে লুবানার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

লুবানা বলল, এই সিদ্ধান্তের জন্যই আপনার কাছে আমি এসেছি।

মা চিন্তিত গলায় বললেন, এভাবে বিয়ে করাটা কি ঠিক হবে ?

কেন ঠিক হবে না ? আমি আমার পছন্দ মতো বিয়ে করতেই পারি!

তা পার।

আমার জীবন আমি আমার মতো কাটাতেই পারি!

তা সবাই পারে। কিন্তু যে মা-বাবা এত কষ্ট করে আজকের এই অবস্থায় তোমাকে এনেছেন, তাঁদের মতের বাইরে গিয়ে, তাঁদেরকে কষ্ট দিয়ে তুমি কি সুখী হতে পারবে মা ?

লুবানা একটু দমে গেল। তার মানে আপনিও গার্জিয়ানদের পক্ষেই কথা বলছেন ?

মা ম্লান হাসলেন। যে-কোনও সন্তানের মা-বাবাই এভাবে কথা বলবেন।

আপনাকে আমি আর একটা কথা জিজ্ঞেস করি ?

কর মা।

যদি মনজু এবং আমি এভাবে বিয়ে করি, আপনি কোনও কষ্ট পাবেন না তো ? আপনি আমাকে মেনে নেবেন তো ?

লুবানার কাঁধে হাত রাখলেন মা। সব জেনে বুঝে তুমি যদি আমার সংসারে আস, আমার ছেলে যদি তোমাকে নিয়ে সুখী হয়, আমি কেন তোমাকে মেনে নেব না, বল ?

লুবানা কথা বলল না।

মা বললেন, তুমি জানো আমি তোমাকে খুবই পছন্দ করি।

জি তা জানি।

তারপরও কষ্ট আমার একটু হবে।

কেন ?

সবার মতে কাজটা হলে ভাল হতো।

মনজুও প্রায় একই রকম কথা বলল।

মায়ের রুম থেকে বেরিয়ে মনজুর রুমে এসেছে লুবানা। মনজুকে সব বলল।

শুনে মনজু বলল, এভাবে বিয়ে করাটা আমিও মেনে নিতে পারব না।

লুবানা যেন আকাশ থেকে পড়ল। কী বলছ মনজু?

ঠিকই বলছি।

আমি তোমার জন্য সব ছাড়তে রাজি হচ্ছি, আর তুমি...

লুবানার গলা কেমন ধরে এল। তুমি যা যা বলেছ আমি তো সবই মেনে নিয়েছি। তারপরও তুমি...

মনজু মায়াবী চোখে লুবানার দিকে তাকাল। তুমি আমার জন্য সব ছাড়তে চাইছ বলেই আমি কিছুই চাইতে পারছি না।

মানে কী কথাটার?

আমি জানি মা-বাবার কাছে সন্তান কতটা মূল্যবান। এমন কি সন্তানের কাছেও মা-বাবা কতটা। এতটা স্বার্থপর আমি কখনই হতে পারব না।

এতে তোমার স্বার্থপরতার কী আছে?

আছে।

আমি বুঝতে পারছি না।

বোঝার চেষ্টা কর।

না, তুমি আমাকে বুঝিয়ে বল।

মনজু আবার লুবানার চোখের দিকে তাকাল। আমি তোমাকে ভালবাসি, আমি তোমাকে চাই।

তাহলে সমস্যাটা কোথায় ?

কিন্তু মা-বাবার বুক খালি করে, তাঁদেরকে কষ্ট দিয়ে তুমি আমার কাছে চলে আসবে, তা আমি চাই না। আমি এই স্বার্থপরতার কথা বলছি।

এবার বুঝেছি।

আর...

আর ?

বাস্তব সত্যি বড় রূঢ়, সত্যি বড় কঠিন।

তা আমি জানি।

না তুমি জানো না। এই মুহূর্তে তোমার চোখে যে মায়াবী পর্দা লেগে আছে, বাস্তবের চাপে তা একদিন খসে যাবে। তখন সব কিছুর জন্য তুমি খুব কষ্ট পাবে। তোমার খুব মন খারাপ হবে।

লুবানা কথা বলল না।

মনজু বলল, আমার ভালবাসার মানুষের কোনও কষ্ট আমি সইতে পারব না। কিছুতেই না, কিছুতেই না।

কথা বলতে বলতে গলা ধরে এল মনজুর। চোখ ছলছল করে উঠল।

কিন্তু তখন আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছে না লুবানা। হুহু করে কেঁদে ফেলল। তাহলে আমি এখন কী করব ? তুমি বলে দাও, আমি এখন কী করব ?

আলতো করে লুবানার একটা হাত ধরল মনজু। কান্নাকাতর গলায় বলল, তুমি ফিরে যাও। তুমি তোমার মা-বাবার কাছে, তোমার নিজস্ব জগতে ফিরে যাও। আমার কথা তুমি মনে রেখো না।

এবার পাগলের মতো দু'হাতে মনজুর গলা জড়িয়ে ধরে শিশুর মতো কাঁদতে লাগল লুবানা। না না। তোমাকে ভুলে আমি থাকতে পারব না। কিছুতেই না। কিছুতেই না।

মনজুরও তখন গাল বেয়ে নেমেছে কান্নাধারা।

এমন করে তাকিয়ে আছ কেন ?

আইরিনের কথায় চোখে পলক পড়ল বিজুর। মুগ্ধ ভঙ্গিতে হাসল সে।

দেখছি।

কী দেখছ ?

বল তো কী ?

আইরিন মিষ্টি করে হাসল। আমি জানি।

তবু বল।

আমাকে।

হ্যাঁ।

আমাকে আজ কেমন লাগছে ?

দারুণ।

আগের চে' বেশি সুন্দর লাগছে ?

আগে মানে ?

আগে মানে আগে। আগে যখন আমাকে তুমি দেখেছ তখনকার চে' আমাকে কি আজ বেশি সুন্দর লাগছে ?

তা তো বলতে পারব না।

কেন ?

কারণ আছে।

কী কারণ ?

বিজু দুষ্টু মুখ করে হাসল। কারণ আগে তো তোমাকে আমি কোনওদিন দেখিইনি।

কী ?

হ্যাঁ। এভাবে কি আমাদের কখনও দেখা হয়েছে ?

না তা হয়নি।

তাহলে ?

কিন্তু আমাকে তো তুমি আমাদের দোতলার বারান্দায় দেখেছ। স্কুলে যাওয়ার সময় দু'একদিন দেখেছ। একদিন স্কুলের ফাংশানে যাওয়ার সময় হলুদ শাড়ি পরা দেখেছ।

তা দেখেছি। তবে সেটা আলগা দেখা।

আলগা দেখা মানে ?

মানে খেয়াল করে দেখিনি।

কেন দেখনি ?

তখন তো তোমার সঙ্গে আমার এফেয়ার হয়নি।

এখন কি হয়েছে ?

বিজু আবার আইরিনের দিকে তাকাল। গভীর চোখে তাকিয়ে বলল, তোমার কী মনে হয় ?

মুখের একটা দুষ্টু দুষ্টু ভঙ্গি করে আইরিন বলল, আমার যাই মনে হোক আমি তোমার মুখ থেকে শুনব। এখন তুমি আমাকে একদম পরিষ্কার করে কথাটা বলবে। সেই কথাটা বলবে বলেই কিন্তু আমি আজ এতটা রিস্ক নিয়েছি।

রিস্ক মানে ?

স্কুল ফাঁকি দিয়ে তোমার সঙ্গে চলে এসেছি। পরনে স্কুলড্রেস, সঙ্গে স্কুলের ব্যাগ। বাড়ির সবাই জানে আমি স্কুলে। অথচ আমি তোমার সঙ্গে রিকশায়।

আমার অবস্থাও তো তোমার মতোই।

কী রকম ?

আমিও তো কোচিংয়ে যাওয়ার কথা বলে বেরিয়েছি। অথচ তোমার সঙ্গে রিকশায়।

কথাটা আইরিন যে ঢংয়ে বলেছিল হুবহু তেমন করে বলল বিজু। শুনে খিলখিল করে হেসে উঠল আইরিন। ডানহাত দিয়ে কুটুস করে বিজুর হাতে একটা চিমটি কেটে দিল।

উহ করে শব্দ করল বিজু। চিমটি কাটছ কেন ?

আমাকে ভেঙালে কেন ?

কোথায় ভেঙিয়েছি ?

ওই যে আমি যেভাবে বলেছি তুমিও সেইভাবে বললে।

এটা বুঝি ভেঙানো হলো ?

হ্যাঁ হলো। আমাকে কেউ ভেঙালে আমি তাকে চিমটি কেটে দিই।

তোমার নখ অনেক লম্বা। ব্যথা পেয়েছি।

এটা তো শুধু চিমটি। আমার কথা না শুনলে কামড় দিয়ে দেব।

কী ?

হ্যাঁ। আমার খুব কামড় দেয়ার স্বভাব।

বাপরে! কার পাল্লায় পড়লাম ?

দিন যাক। টের পাবে কার পাল্লায় পড়েছ।

তা কিছুটা বুঝতে পারছি।

কী বুঝতে পারছ ?

আমার কপালে অনেক খারাপি আছে।

কেমন খারাপি ?

তুমি আমাকে অনেক জ্বালাবে।

হ্যাঁ জ্বালাব। আমার যখন যা মনে হবে তাই করব। আর জানো, আমার কিন্তু খুব জেদ।

জেদ করে কী কর ?

যা ইচ্ছে হয় তাই।

মানুষকে কামড়ে দাও।

মানুষকে না। শুধু তোমাকে কামড়াব।

আচ্ছা শোন, তুমি যে এভাবে স্কুল ফাঁকি দিয়েছ, সত্যি তোমার কোনও অসুবিধা হবে না তো ?

না, কী অসুবিধা হবে! স্কুল ছুটির সময় বাড়ি ফিরে যাব।

তা তো যাবেই।

তাহলে ?

না মানে তোমার বান্ধবীরা কেউ তোমাদের বাড়িতে বলে দেবে না তো ?

না। ওরা জানবে কী করে ?

যদি কেউ তোমাদের বাড়িতে তোমাকে খুঁজতে যায় ?

কেন হঠাৎ আমাকে খুঁজতে যাবে ?

ভাবতে পারে তুমি স্কুলে আসনি কেন ? তোমার কি জ্বরটর হলো কি না। তোমাকে দেখতে তোমাদের বাড়িতে চলে গেল।

আইরিন চোখ পাকিয়ে বলল, এই আমাকে ভয় দেখাবে না। তাহলে কিন্তু আবার চিমটি দেব।

ঠিক আছে। বলব না।

এবার তাহলে সেই কথাটা বল।

রিকশায় কি বলা ঠিক হবে ?

কেন ঠিক হবে না ?

রিকশাঅলা শুনে ফেলবে।

না শুনবে না। তুমি আমার কানে কানে বল।

বলেই ডানদিককার কান বিজুর মুখের কাছে নিয়ে এল আইরিন। সঙ্গে সঙ্গে আইরিনের কানের কাছে মুখ নিল বিজু। ফিসফিস করে বলল, এখন বলব না। আমি খুব ব্যস্ত!

শুনে এমন রাগল আইরিন। আবার একটা চিমটি দিল বিজুকে। আমার সঙ্গে চালাকি!

এবারও উহ্ আহ্ করল বিজু। হাসল।

আইরিন বলল, তুমি একটা চিকন শয়তান।

বিজু অবাক হলো। চিকন শয়তান জিনিসটা কী ?

ওপরে ওপরে খুবই ভদ্র এবং নিরীহ ধরনের কিন্তু ভেতরে ভেতরে শয়তান।

আমি বুঝি তাই ?

হ্যাঁ তুমি তাই। তোমাকে দেখে মনে হয় ইস কী ভদ্র আর নিরীহ! যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। অথচ ভেতরে ভেতরে তুমি মহাদুষ্টু।

তুমি নিজে যা, তোমাকেও কিন্তু তেমন মনে হয় না।

মানে ?

মানে তোমাকে ক্লাশ নাইনের ছাত্রী মনে হয় না।

তা আমি জানি। বড় মনে হয়।

হ্যাঁ।

আমি তো বড়ই।

মানে ?

আমার এখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়ার কথা।

বল কী ?

হ্যাঁ।

তাহলে পড়ছ না কেন ?

এ পর্যন্ত আমি মাত্র দু'বার ফেল করেছি।

যাহ!

সত্যি। ক্লাশ সেভেন এবং ক্লাশ এইটে আমাকে দু'বছর করে পড়তে হয়েছে।

কেন ?

আমি যে ছাত্রী খুব খারাপ।

ক্লাশ সেভেন-এইটে যে ফেল করে, নাইন-টেনে তো সে তাহলে কোনওদিনও পাস করতে পারবে না।

আইরিন নির্বিকার গলায় বলল, আমারও তাই মনে হয়। আমি মনে হয় জীবনেও ম্যাট্রিক পাস করতে পারব না।

তাহলে ?

তাহলে কী ? ম্যাট্রিক পাস না করতে পারলে তুমি আমার সঙ্গে মিশবে না ?

তার আগে জেনে রাখ ম্যাট্রিক পাস বলে কোনও কথা নেই।

জানি এসএসসি। কিন্তু সবাই ম্যাট্রিকই বলে।

ভুল বলে।

ভুল বলতেই পারে। সবাই তো আর তোমার মতো পণ্ডিত না।

আমি বুঝি পণ্ডিত ?

হ্যাঁ। আমি জানি তুমি খুব ভাল ছাত্র। ভাল ছাত্রদেরকে আমি পণ্ডিত বলি। আর সেজন্যই তোমাকে ধরেছি।

ধরেছ মানে ? কীভাবে ধরেছ ?

দিন যাক। টের পাবে। আমি নিজে যেহেতু পচা ছাত্রী এজন্য ভেবেছি যাকে ধরব সে হবে পণ্ডিত।

বিজু হাসল। এবার ধরার অর্থটা বুঝেছি। তাহলে আর দেরি করছ কেন?

কিসের দেরি?

আসল কথাটা বলে ফেল।

আসল কথা যেন কোনটা?

ওই যে যেটা আমার কাছ থেকে শুনতে চাইলে।

কিন্তু তুমি যে আমাকে বলেছ তুমি আগে বলবে!

আমি পারব না। আগে তুমি বল।

ঠিক আছে।

সত্যি বলবে?

সত্যি বলব।

কিন্তু রিকশাঅলা?

শুনতে পাবে না। তুমি কানটা আমার কাছে আনো, আমি ফিসফিস করে বলব।

বিজু হাসল। না তুমি বলবে না। তোমার কোনও মতলব আছে। আমি বুঝেছি।

আইরিনও হাসল। না করব না। সত্যি দুষ্টুমি করব না। সত্যি বলব।

আইরিনের কথা বিশ্বাস করল বিজু। গাল কাত করে আইরিনের মুখের কাছে নিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আলতো করে বিজুর গালে একটা চুমু খেল আইরিন। এই যে বললাম।

আইরিনের ঠোঁটের ছোঁয়ায় বিজু কী রকম দিশেহারা হলো। তারপর অপলক চোখে আইরিনের মুখের দিকে তাকাল।

আইরিনও তাকাল। কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে মাথা নিচু করে বলল, এভাবে তাকিয়ো না।

কেন?

আমার লজ্জা করে।

এইভাবে দুপুরের মুখে মুখে রমনা পার্কে এল ওরা।

রিকশা ভাড়াটা বিজু দিল।

আইরিন বলল, ফেরার সময় রিকশাভাড়া আমি দেব।

কেন?

তোমার সমান সমান থাকতে চাই।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ।

তাহলে আমারও তো উচিত তোমার সমান সমান থাকা।

হ্যাঁ।

কথাটা মনে রেখ।

রাখলাম।

কিন্তু পার্কে নির্জন জায়গা বলতে গেলে পাচ্ছিলই না ওরা। প্রতিটি জায়গায়ই কেউ না কেউ আছে। প্রতিটি বেঞ্চেই কেউ না কেউ আছে। এবং বেশির ভাগই জোড়ায় জোড়ায়। বিভিন্ন বয়সের মানুষ। কিশোর-কিশোরী, যুবক যুবতী, এমন কি মধ্য বয়সী নারী-পুরুষ পর্যন্ত। এবং নানা রকম ঘনিষ্ঠতার মধ্যে আছে তারা। কোথাও ছেলেটি বসে আছে মেয়েটির কাঁধে হাত দিয়ে। কোথাও মেয়েটি আদুরে ভঙ্গিতে দু'হাতে ছেলেটিকে জড়িয়ে ধরে মুখ রেখেছে ছেলেটির বুকের কাছে।

খানিক এইসব দৃশ্য দেখে আইরিন বলল, একেবারে সিনেমার মতো।

বিজু বলল, হ্যাঁ। দেশের সব মানুষই দেখি আমাদের মতো।

মানে ?

কোথাও জায়গা পাচ্ছে না। পার্কে চলে এসেছে।

তাই তো দেখছি।

কিন্তু আমরা বসব কোথায় ?

চল যে-কোনও একটা চিপাচাপায় বসে পড়ি।

কিন্তু চিপাচাপাই তো পাচ্ছি না।

এসময় ঝোঁপের কাছে একটা খালি বেঞ্চ চোখে পড়ল আইরিনের। বলল, চল ওখানে বসি।

চল।

ওরা তারপর বেঞ্চটায় এসে বসল।

আইরিন বলল, কিন্তু দুপুরে খাব কী ?

স্কুলে থাকলে কী খেতে ?

আমাদের স্কুলে টিফিন দেয় তো! লুচি হালুয়া, পরোটা ভাজি। জিলিপি।

আমি তো ওসব দিতে পারব না। কারণ আমি তো কোনও স্কুল না। আমি বিজু।

বিজুর কথা বলার ধরনে হাসল আইরিন। তুমি এত মজা করে কথা বলতে পার!

হ্যাঁ পারি।

তাহলে বল খাবার কী দিতে পারবে দুপুরে?

এই ধরো চকোলেট।

মানে?

মানে একটা মার্স আর একটা মিডিয়াম সাইজের কিটক্যাট এক প্যাকেট পটেটো ক্র্যাকার্স, মানে চিপস আর একটা আরসিকোলা।

শুনে আইরিন প্রায় লাফিয়ে উঠল। সত্যি?

সত্যি।

কিন্তু এসব তুমি পাবে কোথায়?

সঙ্গেই আছে।

মানে?

বিজু তার ব্যাগটা দেখাল। এই ব্যাগে। বাড়ি থেকে বেরিয়েই জিনিসগুলো কিনে ব্যাগে ভরেছি।

শুধু আমার জন্য?

না নিজের জন্যও কিনেছি। কারণ পুরুষ মানুষদেরও খিদে পায়।

আইরিন আবার মিষ্টি করে হাসল। তুমি খুব ভাল।

আমি জানি।

ছাই জানো তুমি! তুমি একটা পচা।

বিজু আর কথা বলল না। চুপ করে কী ভাবতে লাগল।

আইরিন বলল, কী ভাবছ?

লুবানা আপুর কথা।

কী হয়েছে তার?

বেচারির কোনও কিছুই ঠিকঠাক মতো হচ্ছে না।

তুমি না একদিন বললে মনজু ভাইর সঙ্গেই বিয়ে হবে তার।

হ্যাঁ তেমনই তো কথা। কিন্তু একটার পর একটা ভেজাল লাগছে। এখন বোধহয় বিয়েটা হচ্ছেই না।

তাহলে ?

লুবানা আপু খুবই ভেঙে পড়েছে।

ভেঙে পড়ারই তো কথা।

তারপর একটু থেমে আইরিন বলল, কিন্তু হচ্ছে না কেন ?

মনজু ভাইর জন্য।

সে আবার কী করল ?

মনজু ভাই যা যা বলেছেন তাই মেনে নিয়েছে লুবানা আপু। শেষপর্যন্ত লুবানা আপু চেয়েছে গোপনে বিয়ে করে, মানে তার মা-বাবাকে আগে জানাবে না, বিয়ে করে পরে মা-বাবাকে জানাবে এবং এদেশে মনজু ভাইর সংসারে থেকে যাবে। মনজু ভাই তাও চাচ্ছেন না।

কেন ?

বলছেন আমার জন্য তুমি তোমার জীবন নষ্ট করো না। তুমি লন্ডনে তোমার মা-বাবার কাছে ফিরে যাও।

এটা কোনও কথা হলো! যে তার জন্য এত স্যাক্রিফাইস করছে তাকে এভাবে ফিরিয়ে দেয়া ঠিক হচ্ছে না। লুবানা আপুর জায়গায় যদি আমি হতাম তাহলে মনজু ভাইর গলাটা টিপে ধরতাম।

তার মানে আমি যদি তোমার সঙ্গে অমন করি তুমি তাহলে আমার গলা টিপে ধরবে ?

করে দেখো তখন টের পাবে।

কিন্তু তোমার সঙ্গে তো অমন করার আমার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ তোমার সঙ্গে তো আমার মনজু ভাই আর লুবানা আপুর মতো সম্পর্ক না।

তাহলে কেমন সম্পর্ক ?

তা জানি না।

কিন্তু রিকশায় যে তুমি বললে এফেয়ার ?

ভুল করে বলেছি।

তাহলে আমাকে কি এখানেও ভুল করে নিয়ে এসেছ ?

এখন তো তাই মনে হচ্ছে।

কেন ?

তুমি আমাকে পরিষ্কার করে বল তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কী ?

বলার কথা তো তোমার।

কিন্তু আমি চাই তুমি আগে বল।

না।

তাহলে চল টচ করি।

আইরিন উৎফুল্ল হলো। করতে পার।

কিন্তু আমার কাছে কয়েন নেই।

আমার কাছে আছে।

স্কুলের ব্যাগের পকেট থেকে পঞ্চাশ পয়সার চকচকে একটা কয়েন বের করল আইরিন। বিজুর হাতে দিল।

বিজু বলল, তুমি হেড না টেল ?

হেড। কারণ জীবনভর তোমার মাথাটা আমি চিবিয়ে টিবিয়ে খাব। আর তুমি টেল এজন্য, সারাজীবন আমার শাড়ির আঁচল তুমি লেজের মতো করে ধরে রাখবে।

কখনও কখনও রাখাল যেমন গরুর লেজ ধরে রাখে অমন করে ?

হ্যাঁ।

ঠিক আছে।

বিজু তারপর টচ করল এবং হেরে গেল।

খুশিতে আইরিন একেবারে লাফিয়ে উঠল। আমি জিতে গেছি, আমি জিতে গেছি।

বিজু দুষ্টুমির হাসি হাসল। তাহলে বল।

এই না। তুমি আগে বলবে।

কেন ?

যে হারবে সে আগে বলবে।

এমন তো কথা হয়নি।

চালাকি করবে না। বল, তাড়াতাড়ি বল।

ঠিক আছে কানটা আমার মুখের কাছে আন।

না, কেন আনব! এখানে তো কোনও রিকশাঅলা নেই। কেউ শুনতে পাবে না। তুমি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বল।

ঠিক আছে বলছি।

আইরিনের চোখের দিকে তাকাল বিজু। তুমি কিন্তু বলেছ আমরা দুজন সমানে সমান।

হ্যাঁ বলেছি।

তার মানে আমি বললে তুমিও বলবে?

হ্যাঁ।

আইরিনের চোখের দিকে তাকিয়ে গভীর গলায় বিজু বলল, আমি তোমাকে ভালবাসি।

সঙ্গে সঙ্গে আইরিনও মুগ্ধ গলায় বলল কথাটা। আমিও তোমাকে ভালবাসি। খুব ভালবাসি। খুব

তারপর একদিককার গাল এগিয়ে দিল বিজুর ঠোঁটের কাছে। আমরা দুজন সমানে সমান। তুমি আমার গালে চুমু খাও।

বিজু আলতো করে আইরিনের গালে চুমু খেল।

তোমার ভাগ্নির হইছে কী ?

দুলারির কথা শুনে হাবিব একটু চমকাল। টেলিভিশনের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে স্ত্রীর দিকে তাকাল। কী হবে ?

না দুই তিনদিন ধইরা বহুত মনমরা দেখবার লাগছি।

তাই নাকি ?

হ। ক্যালা তুমি খ্যাল কর নাই ?

না তো।

আমি করছি। আইজ বিয়ালে বি দেকলাম দোতালার বারিন্দায় বইয়া আসমানের মিহি চাইয়া রইছে। মুখহান দেইখা এমুন মায়া লাগল আমার। কী হইছে গো মাইয়াডার ? তুমি কিছু জানো ?

রাতেরবেলা ড্রেসিংটেবিলের সামনে বসে মাথা আঁচড়াচ্ছে দুলারি। এই এক স্বভাব তার। ঘুমোবার আগে অনেকক্ষণ ধরে মাথা আঁচড়ায়। তাতে নাকি ঘুমটা তার ভাল হয়।

মাথায় চুলটা অবশ্য অসাধারণ দুলারির। বেশ ঘন, মোটা ধরনের লম্বা চুল। কিন্তু ওদের বংশের ধারা হচ্ছে অল্প বয়সে চুল পেকে যায়। দুলারিরও প্রায় সব চুল পাকা। কিন্তু বুঝবার উপায় নেই। চুলে রেগুলার কলপ লাগায় সে। সাড়ে পাঁচশো টাকা দামের বিদেশী কলপ নিজে গিয়ে কিনে আনে বেইলি রোডের একটা দোকান থেকে। আয়নার সামনে বসে নিজহাতে যত্ন করে লাগায়।

কলপ লাগাবার জন্য আলাদা একটা ড্রেসই আছে দুলারির। পুরনো হলুদ একখানা ম্যাক্সি। যেদিন চুলে কলপ দেবে সেদিন ওই ম্যাক্সিটা পরবে সে।

চুলের কলপ ম্যাক্সিরও বিভিন্ন জায়গায় লেগে যায়। আর ওই জিনিস চুল থেকে পনের-বিশদিন পর উঠে যায় ঠিকই, কাপড়-চোপড়ে লাগলে তা থেকে আর ওঠে না। ফলে হলুদ ম্যাক্সিটার জায়গায় জায়গায় এখন কলপের কালো ছোপ।

চুলের মতো দাঁতও খুব সুন্দর দুলারির। সুগঠিত, ঝকঝকে সাদা শক্ত ধরনের সুন্দর দাঁত। চেহারা খুব মিষ্টি ছিল একসময়। হাসলে সেই চেহারা আরও মিষ্টি হয়ে যেত।

ওসব দেখেই তো পাগল হয়েছিল হাবিব। নয়তো দুলারিদের ফ্যামিলির সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ হওয়ার কথা নয় হাবিবদের। হয়েছিল দুলারির সৌন্দর্যের জন্যই।

সত্যি দুলারি বেশ সুন্দরী ছিল দেখতে।

গায়ের রঙ ফর্সা নয় আবার কালোও নয়। শ্যামলা বলতে যা বোঝায় ঠিক তাই। চেহারা অসম্ভব মিষ্টি। আর আজকের দুলারিকে দেখে কে বলবে প্রথম যৌবনে কী স্লিম সে! অনেকটাই বোম্বের আজকালকার টিভি সিরিয়ালের মেয়েগুলোর মতো। লম্বাও বেশ।

দুলারির সেই সৌন্দর্যের কিছুই এখন আর নেই। বিয়ের পরও তেমন মোটা সে হচ্ছিল না। হলো বিজুর জন্মের পর। সেই যে মোটা হওয়া শুরু হলো আর থামল না।

শরীরের মতো মনের দিক দিয়েও সুন্দর ছিল দুলারি। অত্যন্ত নিরীহ নরম এবং সরল ধরনের মেয়ে। মানুষের জন্য বেশ মায়া। কারও বিপদে-আপদে সাধ্য মতো চেষ্টা করে তার পাশে দাঁড়াবার। ঝগড়াঝাটি কূটনামো এসব মেয়েলি ব্যাপার বেশ কম। কথাও কম বলার স্বভাব। সব মিলিয়ে বেশ ভাল মানুষ সে। এই যে আজ বিকেলে এক ঝলক হয়তো লুবানাকে দোতলার বারান্দায় মন খারাপ করে বসে থাকতে দেখেছে, তাতেই মেয়েটির জন্য বেশ মায়া লেগেছে তার।

কথাটা ভেবে বেশ ভাল লাগল হাবিবের।

লুবানার ব্যাপারটা কি দুলারিকে বলবে হাবিব?

বলা কি ঠিক হবে!

তারপর হাবিব ভাবল, কেন ঠিক হবে না! যে কথা সে জানে সে কথা দুলারি কেন জানবে না! দুলারি তো আর লুবানার কোনও ক্ষতি করতে যাচ্ছে না। সে-

ধরনের মানুষ সে নয়।

মাথা আঁচড়ানো শেষ করে বিছানায় হাবিবের পায়ের কাছে এসে বসল দুলারি। লুবানার কি কেঐর লগে মুহব্বত উহব্বত আছেনি ? ঐ হগল থাকলে তো মনমিজাজ বহুত সময় খরাপ থাকে ?

হাবিব একটু নড়েচড়ে আবার আধশোয়া হলো। আজ বিকেলে লুবানাকে দেখে তোমার কি এরকম মনে হলো ?

হ। মুখহান দেইখা মাইয়াডার লেইগা আমার বহুত মায়া লাগছে। আহা এমুন সোন্দর কচি মুখহান দুঃখে কেমুন ভইরা গেছে। আল্লায় আমারে রহম করছে যে আমারে মাইয়া দেয় নাই। নিজের মাইয়ার অমুন মুখ দেখলে আমি সইবার পারতাম না। কাইন্দা কাইট্টা মইরা যাইতাম।

তুমি তাহলে ওর কাছে গেলে না কেন ?

গিয়া কী করতাম ?

জিজ্ঞেস করতে কী হয়েছে।

হ। তোমার যিমুন কথা। ও কি আমারে কইতো নিহি কী হইছে!

তবে তোমার একটা ধারণা ঠিক।

কোনডা কও তো!

লুবানার একটা ছেলের সঙ্গে প্রেম আছে। সেই ছেলেটির কারণেই মনটা এমন খারাপ ওর।

শুনে উৎফুল্ল হলো দুলারি। দেকছো, আমি ঠিকই আন্তাজ করছি। তয় ছেড়াটা থাকে কই ? লন্ডনে নিহি ?

না। ঢাকায়ই থাকে।

কও কী! এইবার দ্যাশে আহনের বাদে মহব্বতটা হইল নিহি ?

সত্যিকার অর্থে এবারই হয়েছে। তবে লুবানার দিক থেকে ব্যাপারটা বেশ পুরনো।

তোমার কথা আমি কিছুই বুজবার পারতাছি না। আমারে ইট্টু খোলছা কইরা কও তো।

হাবিব তারপর পুরো ব্যাপারটা দুলারিকে খুলে বলল।

শুনে দুলারি প্রথমে কী রকম স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর বলল, ও তাইলে তোমগ বাড়ির এক টাইমের ভাড়াইটা মজনুর লগে মহব্বতটা হইছে।

মজনু না, ছেলেটির নাম মনজু।

ওই হইল। অরে তো আমি চিনিঐ। পোলাপাইনা কাল থিকা দেকছি। ছেড়াটা দেখতে কইলাম ভালঐ। হিরু হিরু ভাব। হুনছিলাম পড়ালেখায় বি ভালা। আমাগ বিজুর লাহান। তয় তুমি যা কইলা হেইডা হুইনা তো মনে হইবার লাগছে ছেড়াটা উপরে উপরে দেখতে হিরু হইলে কী হইব, মানুষ তো ভালা না।

কেন?

ইমুন একহান সোন্দর মাইয়া অরে পছন করছে, অর কাছে ছাদি বইয়া অরে লণ্ডনে লইয়া যাইবার চাইতাছে আর ও বলে ছাদি করব না! লণ্ডনে যাইব না।

যেতে চাচ্ছে না তো মায়ের জন্য।

ক্যালা, মারে ছাইড়া মাইনছে ফরেনে যায় না? আইজ যুদি অর মায়ে মইরা যাইতো, তয়? না না ছেড়াটা ভালা না। লুবানা বহুত ভুল করছে। এই রহম ছেড়ার লেইগা মন খারাপের কাম কী?

হাবিব শান্ত গলায় বলল, তুমি যেভাবে ভাবছ ঠিক তা না। মনজু খারাপ ছেলে নয়।

দুলারি বেশ রেগেছে। ঝাঁঝালো গলায় বলল, খারাপ না হইলে লুবানার লগে ইমুন কামডা ওয় করল ক্যালা?

আসলে খারাপ কিছু করেনি। যা করেছে মায়ের জন্যই করেছে।

আরে থোও, মার লেইগা করছে। এইডা হইল ছেড়াডার বদামী। সোন্দর একহান মাইয়া ছামনে পাইছে, কয়দিন ওইডার লগে মউজ মাইরা অহন কাটি মারছে।

রেগে গেলে যে দুলারির ভাষা আরও খাঁটি হয়ে যায় আজ অনেক দিন পর হাবিব তা টের পেল। অন্য সময় হলে এই নিয়ে খুবই মজা করত সে। হাসি-ঠাট্টা করত।

কিন্তু আজ অবস্থাটা তেমন নয়।

সুতরাং ঠাট্টা-মশকরার দিকে হাবিব গেল না। তাছাড়া লুবানার ব্যাপারে তার মনটাও খুব খারাপ। মনজুকে পাওয়ার জন্য কী অদ্ভুত ব্যাকুলতা তার! কী প্রাণান্ত চেষ্টা! তারপরও সাকসেস মেয়েটা হতে পারল না! প্রথমে যেভাবে চাইল সেভাবে হলো না দেখে মনজুকে বিয়ে করে, বিদেশের অত সুখ স্বাচ্ছন্দের জীবন ফেলে লুকিয়ে বিয়ে করে মনজুর দরিদ্র সংসারে থেকে যেতে চাইল। তাও হলো না।

এমন ব্যর্থতা কেন এল মেয়েটার জীবনে!

আর সবদিক ভেবে মনজুকেও তো কোনও দোষ দেয়া যায় না। এই অবস্থায় মাকে ফেলে সে নিজের সুখের জন্য চলে যায়ই বা কেমন করে!

একটু নড়েচড়ে বসে হাবিব বলল, তুমি যত যাই বল, আমি মনজুর কোনও দোষ দেখছি না।

দুলারি সঙ্গে সঙ্গে ফুঁসে উঠল। তুমি তো দেখবা না। তুমি তো পুরুষপোলা। পুরুষপোলারা পুরুষপোলাগ দোষ তো দেখবার পায় না।

না না তা ঠিক না। আমি তোমাকে যুক্তি দিয়া বোঝাচ্ছি।

থোও তোমার যুক্তিউক্তি।

আরে শোন। মা ছাড়া মনজুর আর কেউ নেই, মনজুর মায়েরও মনজু ছাড়া আর কেউ নেই। এই অবস্থায় মাকে ছেড়ে ছেলেটি যায় কী করে?

ক্যালা, ভাগ্নি যেমতে কইছিল অমতে অর মারে বাছা ভাড়া কইরা দিত। কামের বুয়া উয়া রাইখা দিত। টেকা থাকলে এই হগল কোনও সমস্যা নিহি!

তা এক অর্থে ঠিক। আরেক অর্থে ঠিক না।

কোন অর্থে ঠিক না, কও?

মায়ের কাছে থেকে তার সেবাযত্ন করা, দেখভাল করা, সেটাও তো ছেলের একটা দায়িত্ব। শুধু টাকা দিয়ে কি সেই দায়িত্ব পূরণ হয়?

আইজ কাইল টেকা দিয়াই বেবাক কিছু অহে।

না টাকার বাইরেও আরেকটা ব্যাপার আছে।

কী আছে বুজাও দিহি আমারে?

তোমার ছেলে বিজুকে দিয়েই বুঝাই। ধর আমি নেই। সংসারে তুমি আর বিজু। বিজুর টিউশনির পয়সায় সংসার চলে। কিন্তু বিজু তোমাকে খুব ভালবাসে, তুমিও বিজুকে খুব ভালবাস। দুজন দুজনকে ছাড়া এক মুহূর্ত থাক না, খাও না। এই অবস্থায় বিজু কি বিয়ে করে বিদেশে চলে যেতে চাইবে? মায়ের স্নেহ-মমতার চেয়ে কি স্ত্রী কিংবা প্রেমিকা আর টাকা বেশি হয়ে যেতে পারে এই ধরনের ছেলের কাছে?

বুজলাম তোমার কথা। তয় মায় তো পোলার ভালাডা চাইব।

তা মনজুর মাও চেয়েছে। বললাম না তোমাকে। মনজুই রাজি হয়নি।

এইডাও বুজলাম। তয় ভাগ্নি যহন পলাইয়া ছাদি কইরা থাইকা যাইবার চাইল হেইডায় ছেড়াডা রাজি হইল না ক্যালা?

লুবানার কথা ভেবেই হয়নি।

কী?

হ্যাঁ। ওভাবে বিয়ে করলে লুবানার মা-বাবা দুজনেই বিগড়ে যাবে। লুবানাকে তারা মেনে নেবে না। টাকা-পয়সা ধন-সম্পত্তি থেকে লুবানাকে বঞ্চিত করবে। তাতে মেয়েটা ক্ষতিগ্রস্থ হবে। কেউ কাউকে সত্যিকার ভালবাসলে তাকে কি ক্ষতিগ্রস্থ করতে চায়? মনজুর জায়গায় আমি হলে কি তোমার সঙ্গে এমন করতাম? সত্যিকার প্রেমিকের কি এটা করা উচিত?

হাবিবের কথা শুনে ফ্যালফ্যাল করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল দুলারি। হ, এইডা তো তুমি ঠিক কথা কইছো। তয় তো ছেড়াডা খারাপ না। ছেড়াডা তো ভালা।

আসলে লুবানা এবং মনজু দুজনেই খুব ভাল। আজকালকার দিনে এরকম ভাল ছেলেমেয়ে খুব কমই দেখা যায়। আজকালকার ছেলেমেয়েগুলোর বেশির ভাগই লোভী, স্বার্থপর টাইপের। মায়া-মমতা কম। প্রেম-ভালবাসা বলতে সেক্স ছাড়া কিচ্ছু বোঝে না। একজনকে ছাড়ছে একজনকে ধরছে। বিচ্ছিরি। এরকম সময়ে লন্ডনে বড় হওয়া লুবানা সত্যি এক আশ্চর্য মেয়ে। মনজুও আশ্চর্য ছেলে। মায়ের জন্য এমন টান, এমন স্যাক্রিফাইস করার মনোভাব আজকাল দেখাই যায় না।

হ গো। মজনুর জাগায়, না না মনজুর জাগায় অন্য ছেড়ারা হইলে মারে ফালায় থুইয়া কবে লুবানারে ছাদি কইরা যাইতো গা। মায় বাঁচল না মরল চাইয়া বি দেখতো না।

হাবিব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কিন্তু দুজন মানুষই কেমন দুঃখী হয়ে গেল ভাব তো! সারাটা জীবন দুজন দুজনার কথা ভেবে কাটাবে। হয়ত দুজনেই যে যার মতো বিয়েশাদি করে সংসার করবে কিন্তু সময়ে-অসময়ে মনে পড়বে দুজনার কথা। মনের ভেতর আফসোস একটা থেকেই যাবে। মনে হবে দুজন যদি দুজনকে পেত তাহলে এই জীবন তাদের অন্যরকম হতো।

ঠিকঐ কইছো।

আমাদের নিজেদের কথা ভাব তো! তোমার আর আমার কথা। কী কষ্টটা দুজন দুজনকে পাওয়ার জন্য করেছি। না তোমাদের বাড়ি থেকে আমাকে মেনে নিতে চাইছে, না আমাদের বাড়ি থেকে মেনে নিতে চাইছে তোমাকে। অথচ দুজন দুজনার জন্য পাগল হয়ে আছি। তুমি নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দিয়েছ। আমি পাগলের মতো রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়াই। শেষপর্যন্ত সবাই মেনে নিল আমাদেরকে। বিয়েটা হলো। যদি না হতো আজ আমাদের অবস্থা কী দাঁড়াত বল তো!

এইসব মুহূর্তে দুলারি কখনও কখনও অতি আবেগে আক্রান্ত হয়।

এখনও হলো।

একহাতে হাবিবের কোমরের কাছটা ধরল সে। না গো, তোমারে ছাইড়া থাকতে হইলে আমি আর বাঁচতাম না। মইরা যাইতাম। আর তোমার লগে ছাদি না হইলে আমার ছোনার চান বিজুরে আমি কই পাইতাম, কও!

তাহলে ওদের দুজনার অবস্থাটা এখন ভাব তো!

এবার দুলারিও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। হাচাঐ। দুইজনের লেইগাঐ আমার অহন মায়া লাগতাছে।

বেশি লাগছে কার জন্য?

ভাগ্নির লেইগা। এত কষ্ট মাইয়াডা করল তা বি মনের মানুষটারে পাইল না।

আর আমার কষ্ট হচ্ছে মনজুর জন্য। চাইলেই স্বপ্নের মতো একটা জীবন পেতে পারত সে, মায়ের জন্য সেই স্বপ্নের জীবন ছেড়ে দিল। আজকালকার দিনে এমন স্যাক্রিফাইস একেবারেই দেখা যায় না। সিনেমার মতো।

সকালবেলা দোকানে যাওয়ার জন্য রেডি হচ্ছে হাবিব, লুবানা এসে দরজার সামনে দাঁড়াল।

পারমিশান না নিয়ে কারও রুমে ঢোকে না সে। এখন মাত্র বলবে, ছোটমামা, আসব! তার আগেই দুলারি তাকে দেখে ফেলল। স্নিগ্ধ, মায়াবী গলায় বলল, আহ মা। ভিতরে আহ।

নিঃশব্দে ভেতরে এসে ঢুকল লুবানা।

হলুদের কাছাকাছি রঙের একটা সালোয়ার-কামিজ পরা। কিন্তু মিষ্টি সুন্দর মুখখানা গভীর বিষণ্ণতায় ছাওয়া। চোখের কোলে বেশ গাঢ় হয়ে কালি পড়েছে। দেখে বোঝা যায় কয়েক রাত ধরে ঘুম তার একেবারেই হচ্ছে না।

এই মুখের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারল না দুলারি। বুকটা হুহু করে উঠল তার।

হাবিবেরও একই অবস্থা।

তবু কষ্ট চেপে রেখে হাবিব বলল, কী খবর তোর?

লুবানা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। কথা বলল না।

দুলারি এগিয়ে এসে দু'হাত ধরে বেতের একটা চেয়ারে বসাল লুবানাকে। বহ মা, বহ।

লুবানা বসল।

তারপর বলল, আমি চলে যেতে চাচ্ছি মামা!

কবে ?

দু'চারদিনের মধ্যেই।

কেন হঠাৎ চলে যাওয়ার মতো কী হলো ? তুই না বলেছিলি দু'তিনমাস থাকবি।

লুবানা কথা বলল না। আবার মাথা নিচু করল।

লুবানার মুখোমুখি বিছানায় বসল হাবিব। তোর মামির সামনে সব কথাই বলতে পারিস তুই। তাকে আমি তোদের কথা সবই বলেছি।

লুবানা ম্লান গলায় বলল, বলে আর লাভ হলো কী ? সব তো শেষই হয়ে গেল।

দুলারিও বসল স্বামীর পাশে। এত ভাইঙ্গা পড়ছ ক্যালা মা ? আল্লাহর উপরে ভরছা রাখ। আল্লাহ চাইলে অহে না, এমুন কাম তো দুন্নাইতে নাই। বেবাক কিছু আবার ঠিক বি হইয়া যাইবার পারে।

না তা আর পারে না।

হাবিব বলল, মনজুর সঙ্গে ওর মা'র সঙ্গে তোর কি আর দেখা টেখা হয়েছে ?

হয়েছে।

কী বলল ওরা ?

আর নতুন করে কী বলবে! তুমি তো জানোই সব।

তারপরই কি তুই চলে যাওয়ার ডিসিসান নিলি ?

হ্যাঁ। যে জন্য আসা সেই যদি আমার না হলো তাহলে আমি আর কী জন্য এদেশে থাকব ?

লুবানার চোখ দুটো ছলছল করে উঠল।

হাবিব এবং দুলারি দুজনেই তখন স্তব্ধ হয়েছে। লুবানার মুখের দিকে তাকাতে পারছে না। বুক হুহু করছে দুজনারই।

তবু হাবিব বলল, আমাদের জন্য না হয় আরও কিছুদিন থেকে যা। আমরা তোকে নিয়ে কোথাও গিয়ে ক'দিন বেরিয়ে আসি। কক্সবাজার না হয় সেন্টমার্টিন দ্বীপ। মহেশখালি অথবা রাঙামাটি। না হয় সিলেটে গেলাম তামাবিলের দিকে। তাতে তোর মনটা হয়ত একটু চেঞ্জ হবে।

আমার মন আর কিছুতেই চেঞ্জ হবে না মামা।

দুলারি বলল, তোমার মামার কথা হোনও মা। থাইকা যাও আরও কয়দিন।

হাবিব বলল, এখন লন্ডনে গিয়ে তো তোর আরও খারাপ লাগবে। তুই তো আরও একা হয়ে যাবি।

হ্যাঁ তা হব। সকালবেলা মা-বাবা দুজন চলে যাবে তাদের রেস্টুরেন্টে। আমি থাকব বাড়িতে একা। কিংবা আমাকে ডিপ্রেস দেখে মা কিংবা বাবা আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে তাদের রেস্টুরেন্টে। কিন্তু আমি জানি আমার কিছুই ভাল লাগবে না। আমার দিন কাটতে চাইবে না, রাত কাটতে চাইবে না।

দোকানে যেতে দেরি হয়ে যাচ্ছে হাবিবের কিন্তু সেসব সে ভাবছে না। লুবানার জন্য মনটা খুবই খারাপ লাগছে।

দুলারিও আছে কেমন স্তব্ধ হয়ে।

লুবানা ধরা গলায় বলল, অথচ কত সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন আমি এবার দেখেছিলাম। মনজুর সঙ্গে বিশাল ধুমধাম করে বিয়ে হবে। মা-বাবা আসবে লন্ডন থেকে। তোমরা থাকবে, আমাদের সব আত্মীয়স্বজনরা থাকবে। মনজুকে নিয়ে বাংলাদেশের সুন্দর সুন্দর জায়গাগুলো ঘুরে বেড়াব। তারপর চলে যাব লন্ডনে। লন্ডনে আমাদের বাড়িটা দোতলা, বেশ বড়। দোতলায় থাকব আমি আর মনজু। নিচতলায় মা-বাবা। তারপর যখন মনজুর মাকে নিয়ে যেতে পারব তখন আলাদা একটা বাড়ি কিনব আমি। আমরা তিনজন মানুষ নিজেদের মতো একটা জগৎ গড়ে তুলব। কিচ্ছু হলো না, কিচ্ছু হলো না। আমার সব স্বপ্ন ভেঙে তছনছ হয়ে গেল।

দু'হাতে মুখ ঢেকে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল লুবানা।

লুবানার কান্না দেখে হাবিব স্তব্ধ হয়ে বসে রইল কিন্তু দুলারি একেবারেই দিশেহারা হয়ে গেল। প্রথমে বুঝতে পারল না কী করবে, তারপর উঠে এসে দু'হাতে লুবানার মাথাটা বুকে জড়িয়ে ধরল। কাইন্দো না মা, কাইন্দো না।

দুলারি জড়িয়ে ধরার পর লুবানাও দুহাতে জড়িয়ে ধরল দুলারির কোমরের কাছটা। শিশুর মতো কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমার এমন হলো কেন মামি? কেন এমন হলো? কী অন্যায় আমি করেছি, বল! কী অন্যায় করেছি!

দুলারি কোনও কথা বলতে পারল না। লুবানার কান্নায় তার চোখেও জল এসে পড়েছে। নিঃশব্দে সেও তখন কাঁদছে।

নিজের রুম থেকে বেরিয়েই লুবানাকে দেখতে পেলেন মা।

অবাক গলায় বললেন, কী গো মা, কখন এলে তুমি?

লুবানার মুখটা আজ দুঃখী, বিষণ্ন। চোখ দুটো একটু ফোলা ফোলা। দেখে বোঝা যায় গোপনে গোপনে অনেক কেঁদেছে সে।

মায়ের কথা শুনে বিষণ্ন গলায় বলল, এক্ষুণি।

এসো মা, এসো। আমার ঘরে এসে বস।

মায়ের সঙ্গে তাঁর ঘরে ঢুকল লুবানা।

হাত ধরে লুবানাকে তাঁর বিছানায় বসালেন মা। বস মা, বস।

কিন্তু নিজে বসলেন না মা। লুবানার সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন।

লুবানা মন খারাপ করা গলায় বলল, আমি কাল চলে যাব।

কী?

হ্যাঁ। এজন্যই ভাবলাম আপনার সঙ্গে একটু দেখা করে যাই।

চোখের জল সামলাবার জন্য মাথা নিচু করল লুবানা।

মারও তখন চোখ ছলছল করছে। ধরা গলায় বললেন, আমাদের দুর্ভাগ্য তোমাকে এই সংসারে রাখতে পারলাম না মা।

মা কেঁদে ফেললেন। আমার মনজুর পাশে তোমাকে আমি রাখতে পারলাম না।

মায়ের কথা শুনে দু'হাতে তাঁর কোমরের কাছটা জড়িয়ে ধরল লুবানা। জড়িয়ে ধরে শিশুর মতো কাঁদতে লাগল। আমার এমন হলো কেন? আমি তো কখনও কোথাও কোনও অন্যায় করিনি। সারাটা জীবন ধরে একজন মানুষকেই

চেয়েছি। সে কেন আমার সঙ্গে এমন করল ? সে কেন আমাকে ফিরিয়ে দিল ? আমি তো তার জন্য সব ছাড়তে চেয়েছি! তাহলে কেন সে আমার সঙ্গে এমন করল ?

মা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, এটা তারও দোষ নয় মা। এটা আমাদের কারও দোষ নয়, দোষ আমাদের নিয়তির। নিয়তি চায়নি তুমি আমার সংসারে থাক। আমার দুঃখী দরিদ্র সংসার আলোকিত করে রাখ। আমার অসহায় ছেলেটির পাশে থাক। আমাদের জীবনটা বদলে দাও। দুর্ভাগ্য তোমার নয় মা, দুর্ভাগ্য আমার। আমাদের।

মাকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ কেঁদে শান্ত হলো লুবানা। কান্নার পরে থমথমে গলায় বলল, মনজু আছে ?

মা চোখ মুছে বললেন, না। টিউশনিতে গেছে।

কখন ফিরবে ?

তাতো বলতে পারি না।

তাহলে বোধহয় ওর সঙ্গে আর দেখা হবে না।

কেন মা ? তুমি একটু অপেক্ষা কর।

খুব বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারব না।

কেন ?

চলে যাওয়ার আগের দিন কিছু কাজ থাকে।

গোছগাছ ?

জি। কিছুই করা হয়নি এখনও।

তাহলে ?

আমি এখন চলে যাব।

আমি কি মনজুকে বলব তোমার নানার বাড়িতে গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করে আসতে ?

না দরকার নেই। আমি বরং ওর রুমে একটু যাই।

হ্যাঁ যাও মা, যাও।

লুবানা তারপর মনজুর রুমে গিয়ে ঢুকল। রুমটির চারদিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর মনজুর টেবিলে বসে চিঠি লিখতে লাগল।

আশ্চর্য ব্যাপার, কয়েক মিনিটের মধ্যেই মনজু এসে ঢুকল রুমে। খুবই মনমরা বিপর্যস্ত চেহারা তার। তবু লুবানাকে দেখে অবাক হলো সে। তুমি ? তুমি কখন এলে ?

লুবানা চোখ তুলে মনজুর দিকে তাকাল। অনেকক্ষণ।

কিন্তু লুবানার চোখ দেখে, মুখ দেখে মনজু বুঝে গেল লুবানা খুব কেঁদেছে।

লুবানার এই মুখ সহ্য করতে পারল না সে। তারও চোখ ভরে এল জলে। চোখের জল সামলাতে অন্যদিকে মুখ ফেরাল মনজু।

লুবানা শূন্য গলায় বলল, আমি অনেকক্ষণ আগে এসেছি।

নিজেকে সামলাল মনজু। মা'র সঙ্গে দেখা হয়েছে ?

হ্যাঁ।

মনজু কথা বলল না। নিজের বিছানায় বসল।

লুবানা বলল, আমি কাল চলে যাব।

মনজু চমকাল। কালই ?

হ্যাঁ। এজন্য দেখা করতে এসেছিলাম। কিন্তু তোমাকে না পেয়ে, মানে তুমি নেই দেখে চিঠি লিখে রেখে যাচ্ছিলাম।

একটু থামল লুবানা। তারপর বলল, দেখা তো তোমার সঙ্গে হয়েই গেল। চিঠির আর দরকার কী ?

বলে চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলতে গেল।

পাগলের মতো ছুটে এসে লুবানার হাত ধরল মনজু। থাবা দিয়ে চিঠিটা নিয়ে নিল। না না, না। না ছিঁড়বে না। ছিঁড়বে না।

মনজুর আচরণে অবাক হলো লুবানা। কেন ?

এ আমার সম্পদ। এটা ছেঁড়ার অধিকার তোমার নেই।

চিঠিটা ভাঁজ করে বুক পকেটে রাখল মনজু।

লুবানা বলল, মাত্র একটা লাইন লিখেছিলাম।

হোক।

সেই লাইনটাও সম্পূর্ণ নয়। শুধু সম্বোধন।

হোক। তবু এ আমার সম্পদ। আমি বুক দিয়ে চিরকাল এই সম্পদ আগলে রাখব।

লুবানা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মানুষটাকে রাখার সাহস পেলে না, রাখছ তার চিঠি।

হাত ধরে লুবানাকে নিজের বিছানায় এনে বসাল মনজু। মানুষটা তো আমারই। যত দূরেই থাকুক, সে তো থাকবে আমার হৃদয় জুড়ে। আমার মন আত্মা, চিন্তা চেতনা সব জুড়ে থাকবে সে।

লুবানা চোখ তুলে মনজুর দিকে তাকাল।

মনজু বলল, কাল তুমি চলে যাবে ঠিকই, কিন্তু তুমি কি জানো, তুমি চলে যাওয়ার পর থেকে, আমি প্রতিটি মুহূর্ত তোমার জন্য অপেক্ষা করব।

কেন ?

আমার মনে হবে চলে তুমি যাওনি। তুমি এই শহরেই আছ। যখন তখন আমার কাছে চলে আসবে। তোমার সে রকম চলে আসার জন্য অপেক্ষা করব আমি। অপেক্ষা করব আর ভাবব, এই বুঝি আমার মানুষটা আমার কাছে ফিরে এল। এই বুঝি!

আজও দু'হাতে সেদিনকার মতো মনজুর গলা জড়িয়ে ধরল লুবানা। হুহু করে কেঁদে ফেলল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমি ফিরে আসব। আমি সত্যি তোমার কাছে ফিরে আসব। তোমাকে ছাড়া এ জীবন আমি কাটাব না। মা-বাবা দুজনকে বুঝিয়ে যেমন করে পারি আমি তোমার কাছে ফিরে আসব। তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করো সোনা!

লুবানাকে বুকে জড়িয়ে মনজুও তখন আকুল হয়ে কাঁদছিল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমি অপেক্ষা করব। আমি সারাজীবন তোমার জন্য অপেক্ষা করব। যতদিন তুমি না ফিরবে আমি অপেক্ষা করব। যখন অপেক্ষার কষ্ট আমার সহ্য হবে না, তখন আমি সেই পার্কটিতে চলে যাব। লেকের ধারে সবুজ একটুকরো মাঠ, মাঠের কোণে তালগাছ। সেই গাছতলায় বসে সেখানকার আকাশ, গাছপালা, লেকের জল, বহমান হাওয়া আর সবুজ ঘাসের দিকে তাকিয়ে বলব, তোমরা সাক্ষী, সে আমায় ভালবাসে। কথা দিয়েছে, সে আমার কাছে ফিরে আসবে। আমি তার জন্য অপেক্ষা করছি। আকাশ আমাকে বল, জল হাওয়া গাছের পাতা, পাখির গান আর সবুজ ঘাসের মাঠ আমাকে বল, কবে শেষ হবে এই অপেক্ষার কাল ? কবে সে ফিরবে ?

মনজুর গলার কাছে মুখ রেখে কাঁদতে কাঁদতে লুবানা বলল, আর আমি যতদিন ফিরতে না পারব, আমারও হবে তোমার মতো কষ্ট। আমার দিনগুলো

কাটবে না, আমার রাতগুলো কাটবে না। প্রতিটা মুহূর্ত আমার কাটবে তোমার কথা ভেবে। কবে আমি তোমার কাছে ফিরব। কবে আমি সম্পূর্ণ করে তোমাকে পাব! আর যে রাতে খুব চাঁদ উঠবে, আমাদের বাড়ির সামনের পার্ক আর মাইল মাইল সবুজ ঘাসের মাঠ চাঁদের আলোয় ভেসে যাবে, আমি একাকী চলে যাব সেই মাঠে। গিয়ে সেই নির্জন রাতে একাকী বসে থাকব মাঠের মাঝখানে। আমার মাথার ওপর থাকবে চাঁদ, চারদিকে থাকবে চাঁদের আলো। ফুলের সুবাস নিয়ে বইবে মিষ্টি মোলায়েম হাওয়া। সেই হাওয়ার কানে কানে আমি বলব, তুমি ওর কাছে আমার বারতা বয়ে নিয়ে যাও। ও আমার চাঁদের আলো। ওর আলোয় আমার জীবন আলোকিত। হাওয়া, ওকে তুমি বল, আমি ওর কাছেই ফিরব। ওর কাছেই।